ইউনিট 7

বীমার মৌলিক ও সাধারণ ধারণাসমূহ
Basic and General Concepts of Insurance

ভূমিকা

আদিমকালে মানুষ নানা ধরনের প্রাকৃতিক দুর্যোগজনিত ঝুঁকি এবং খাদ্য প্রাপ্তির অনিশ্চিয়তার সম্মুখীন হত। সুতরাং আমরা বলতে পারি মানুষ আদিকাল থেকেই বিভিন্ন ঝুঁকি ও অনিশ্চয়াতার মধ্যে বসবাস করে আসছে। মানুষের প্রতিটি মূহুর্তই ঝুঁকিপূর্ণ। ঝুঁকি ছাড়া মানুষের জীবনের কথা ভাবাই যায় না। আর ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা আছে বলেই মানুষ তা জয় করার জন্য প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। তারই ফলে মানুষের মধ্যে প্রতিযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠেছে। এ প্রসঙ্গে কার্ডিনাল নিউম্যান বলেছেন,"জীবনের ব্যর্থতার অনিশ্চয়তা বা বিপত্তি যদি না থাকতো তাহলে তো কোন বিজয়োল-াস অথবা বিজয়োৎসবই হতো না।" আর এ কারণেই সম্ভবত: মানুষের জীবনে এত বিপদ-আপদ, বিপর্য ও অনিশ্চয়তা থাকা সত্বেও মানুষ আজও অনিশ্চয়তার স্বাদ পাচ্ছে। মানুষ চায় তার বাধা অতিক্রম করে লক্ষ্যে পৌঁছে যেতে। সে কারণে রবীন্দ্রনাথ- "তোরা যে যা বলিছ ভাই আমার সোনার হরিণ চাই"। সেক্ষেত্রে সে হয় বাধার সম্মুক্ষীণ। যার ফলে, কখনও কখনও হতাশায় নিপতিত হয়। থেমে যায় তার চলার গতি। আর মানুষের চলার গতিকে স্বচল রেখে সামনের পথ মসৃন রাখার জন্য ঝুঁকিকে ভাগাভাগি করে নিতে এগিয়ে এসেছে একটি বিশেষ দল, যারা বীমা কোম্পানী নামে অবহিত। বীমা মানুষের বিভিন্ন চলার পথ গতিশীল রাখার নিশ্চয়তা প্রদান করে। বীমা বিশেষ করে অর্থনৈতিক ঝুঁকি বহন করে, তার বিনিময়ে বীমাগ্রহীতাকে আর্থিক অনুদান অর্থাৎ প্রিমিয়াম দিতে হয়। বীমার আওতা এখন অনেক ব্যাপক ও বিস্তৃত। যেমন, জীবন বীমা, নৌ-বীমা, অগ্নি-বীমা, দূর্ঘটনা বীমা, সামাজিক বীমা, মটরযান বীমা ইত্যাদি। বীমার ফলে অর্থনৈতিক চাকা গতিশীল হয়েছে। উৎপাদক, বিনিয়োগকারী, ব্যক্তি জীবন অনেকাংশেই এখন ভাবনাহীন। শিক্ষার্থীগণ এই ইউনিট থেকে বীমার ধারণা, ইতিহাস, প্রকৃতি, কার্যাবলি, বীমা চুক্তি, নীতিমালা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে পারবেন। এবার আসুন আমরা একটি একটি করে জানার চেষ্ঠা করি।

পাঠ- ১ বীমার সংজ্ঞা, উৎপত্তি ও প্রকৃতি
Definition, Origin and Nature of Insurance

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ বীমার সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- ☞ বীমার উৎপত্তি সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- ☞ বাংলাদেশের বীমা ব্যবসার উন্নয়নের ধারা বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ বীমার প্রকৃতি ব্যাখ্যা করতে পারবেন।
- ☞ বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমি সম্পর্কে জানতে পারবেন।

বীমার সংজ্ঞা

আসুন শুরুতেই একটি অনুশীলন করি। সেটি হল- আপনি পাশের মুদি দোকান ও একটি ব্যাংকের কার্যক্রম লক্ষ্য করুন। মুদি দোকানে দেখবেন নানা ধরনের ব্যবসায়িক পণ্য, ব্যাংকে দেখতে পাবেন টাকার আদান প্রদান। ব্যাংকের পাশে আপনি হয়ত একটি বীমা কোম্পানির সাইনবোর্ড দেখতে পারেন। এখন যদি আপনাকে বলা হয় দেখুনত এটি কিসের ব্যবসা করে। দেখবেন এটি মানুষ এবং ব্যবসা প্রতিষ্ঠানের ঝুঁকির ব্যবসা করে। বীমার মূল কথা হলো ঝুঁকি হস্তান্তর করা। এতে দুটি পক্ষ থাকে, এক পক্ষ টাকার বিনিময়ে ঝুঁকি অন্যের নিকট হস্তান্তর করে তাকে বীমা গ্রহীতা বলে। পক্ষান্তরে, যিনি টাকার বিনিময়ে ঝুঁকি গ্রহণ করেন তকে বীমাকারী বলা হয়। ধরুন, আপনার একটি বাস আছে, যা ঢাকা কুষ্টিয়া রুটে চলাচল করে। এটি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ধ্বংস হতে পারে। ফলে আপনি সর্বস্ব হারাতে পারেন। কিন্তু, আপনি যদি উক্ত বাসটি কোন বীমা কোম্পানীর নিকট নির্দিষ্ট

প্রিমিয়াম দিয়ে বীমা করেন, তবে আপনার গাড়ী দুর্ঘটনায় ধ্বংস হলে বীমা কোম্পানী ক্ষতিপূরণ দিবে। এক্ষেত্রে আপনি একজন বীমা গ্রহীতা ও উক্ত কোম্পানীটি বীমাকারী। আপনার ঝুঁকিটি টাকার বিনিময়ে আপনি বীমা কোম্পানীর নিকট হস্তান্তর করেছেন।

এম,এন মিশ্র দুটি দৃষ্টি কোন থেকে বীমার সংজ্ঞা প্রদান করেছেন।

যথা:

১। কার্যভিত্তিক সংজ্ঞা ও

২। চুক্তি ভিত্তিক সংজ্ঞা।

কার্যভিত্তিক সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে, "নির্দিষ্ট কোন ঝুঁকিজনিত ক্ষয়-ক্ষতিকে, উক্ত ঝুঁকির আওতায় যে সব ব্যক্তি থাকে এবং যাকে উক্ত ঝুঁকির বিরুদ্ধে নিজেদেরকে রক্ষা বা নিশ্চিত করতে চান, তাদের মধ্যে ঝুঁকি বন্টনের একটি সমবায় পন্থাকেই বীমা বলা হয়।"

পক্ষান্তরে, চুক্তিভিত্তিক বীমার সংজ্ঞায় বলা হয়েছে যে,"বীমা হলো এমন কিছু (চুক্তি) যার মাধ্যমে কোন স্বীকৃত আকস্মিক বিপর্যয়ের জন্য বিপুল পরিমাণ অর্থ পরিশোধের ব্যাপারে বীমাকারী কতৃক ঝুঁকি বহনের বিনিময়ে বা প্রতিদানে বীমা সেলামী বা কিস্তি হিসেবে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণের অর্থ পরিশোধ বা প্রদান করা হয়।" এবার আসুন এগুলো সম্পর্কে বিস্তারিত জানি।

উপরোক্ত সংজ্ঞাকে বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে,

১। বীমা হলো একটি চুক্তি যা দু'টি পক্ষের মধ্যে সম্পাদিত হয়

২। এক পক্ষ অপর পক্ষকে প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে নির্ধারিত সেলামী প্রদান করে

৩। অপর পক্ষ সেলামীর বিনিময়ে বিপুল পরিমাণ টাকা প্রদানের প্রতিশ্রুতি দিয়ে থাকে

৪। তবে, প্রতিশ্রুত অর্থ দেবার বিষয়টি নির্ভর করে বীমাকৃত ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটার উপর।

আরউইন এম, টেলর এর মতে,"বীমা চুক্তি হলো প্রিমিয়াম পরিশোধের প্রতিদানে এক পক্ষ কতৃক অপর পক্ষের উপর সম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকি গ্রহণ সংক্রান্ড় সম্মতি যা এরূপ অনেক ঝুঁকির দায়িত্ব গ্রহণের সাধারণ প্রকল্পের অংশ বিশেষ।"

তাই বীমা হলো একটি চুক্তি, যার বিনিময়ে এক পক্ষ তার জীবন বা সম্পদের ঝুঁকি কমাতে অপর পক্ষকে নির্দিষ্ট পরিমাণ প্রিমিয়াম প্রদান করে এবং অপর পক্ষ উক্ত প্রিমিয়ামের বিনিময়ে ১ম পক্ষের জীবন বা সম্পদের অর্থনৈতিক ঝুঁকি গ্রহণ করে অর্থাৎ কোন ঘটনা বা দুর্ঘটনা ঘটলে আর্থিক ক্ষতিপূরণের প্রতিশ্রুতি প্রদান করে। এবার আসুন বিষয়টি একটি উদাহরণের সাহায্যে আরো ভাল করে জেনে নিই। ধরুন, ঢাকা-আরিচা রোডে আপনার একটি গাড়ি চলে। গাড়িটি মূল্য ২০ লক্ষ টাকা। গাড়িটি দুর্ঘনায় পতিত হলে আপনি বিরাট ক্ষতির সম্মুখীন হলে। এ ধরনের ঘটনা চিন্তা করে আপনি একটি বীমা কোম্পানীর সাথে চুক্তিতে আবদ্ধ হতে পারেন। ধরি, মাঝে ৫,০০০/= টাকা করে বীমা কোমআনিকে প্রদান করলে কোম্পানিটি দুর্ঘটনাজনিত ক্ষতির পুরোটাই আপনাকে প্রদান করবেন। এখানে প্রথম পক্ষ হল আপনি এবং দ্বিতীয় পক্ষ হল বীমা কোম্পানি। যে, ৫,০০০/= টাকা প্রতিমাসে প্রদান করবেন তাহল Premium বা সেলামী। ২০ লক্ষ টাকা হল পলিসি।

বীমার উৎপত্তির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস

বীমার উৎপত্তি সম্পর্কে সুনির্দিষ্ট ইতিহাস বলা অত্যন্ত কঠিন। তবে বিভিন্ন ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে, বিশ্ব সভ্যতার এক পর্যায়ে ভূমধ্যসাগরের উত্তর অঞ্চলে-বিশেষত: ইতালীকে কেন্দ্র করে ইউরোপীয় কিছু দেশে খৃষ্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীর দিকে বীমা ব্যবসায়ের শুরু হয়। পরবর্তীতে সভ্যতার ক্রমবিকাশের সাথে সথে গ্রেটবৃটেনকে কেন্দ্র করে ইউরোপে যে শিল্প বিপ□ব সংঘটিত হয়, যার ফলে ব্যবসা বাণিজ্যের প্রসারের সাথে সাথে বীমা ব্যবসা প্রসার লাভ করতে থাকে। বীমা ব্যবসা ইউরোপ থেকে পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বিস্তার ঘটে, যা আমাদের উপ-মহাদেশ পর্যন্ত বিস্তারলাভ করে। প্রাথমিক পর্যায়ে বীমা ব্যবসা প্রধানত: সমবায় পন্থায় উৎপত্তি এবং চালু থাকে। নিম্নে বীমা ব্যবসায়ের ক্রমবিকাশ সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

নৌ-বীমা (Marine Insurance)

নৌ-বীমার মাধ্যমে প্রথমে বীমা ব্যবসার উৎপত্তি ও প্রতিষ্ঠালাভ করে। তাই নৌ-বীমাই সবচেয়ে প্রাচীনতম বীমা। এটা সম্ভাবত উত্তর ইটালীতে ১২০০ এবং ১৩০০ শতাব্দীতে নৌ-বীমা শুরু হয়। ১৩০০/১৪০০ শতাব্দীতে ইটালীয়ান ব্যবসায়ীগণ যুক্তরাজ্যে ব্যবসায়ের জন্য পণ্য নিয়ে যাওয়া এবং তার সাথে নৌ-বীমার ধারণাও সম্মৃক্ত করে। তবে, সেক্ষেত্রে বর্তমানের মত তখন নৌ-

বীমার প্রচলন ছিল না; তখন ব্যবসায়ীরা নৌ-বীমাকে আলাদাভাবে না করে সাধারণ ব্যবসায়ের পাশাপাশি বীমা ব্যবসা পরিচালনা করত।

লমবার্ড ষ্ট্রিট অব ইংলসন্ড (যা ইটালীয় ব্যবসায়ী লমবার্ডের নাম অনুসারে) নৌ-বীমার কেন্দ্রস্থল হিসেবে কার্যক্রম করতে থাকে। এখানে বিভিন্ন ব্যবসায়ীগণ তাদের ব্যবসা ও বীমা নিরাপত্তার জন্য একত্রিত হতো। কিন্তু, তখন নৌ-বীমা পরিচলনার বড় সমস্যা ছিল এখানে সুনির্দিষ্ট কোন নিয়ম কানুন না থাকায় কোন বীমা দাবী মিটাতে জটিলতা দেখা যেত। তখন কোন জটিলতা দেখা দিলে Admiralty Court এ পাঠানো হতো। পরবর্তীতে Chamber of Assurance স্থাপিত হয়, যেখানে বীমা পলিসি নিবন্ধন করা হতো। নিবন্ধনের সময় বিভিন্ন শর্ত ও নিয়ম নীতির উল্লেখ থাকায় দ্বন্দের পরিমাণ অনেক কমে যায়। ১৬০১ সালে Court of Arbitration স্থাপিত হয়, যা নৌ-বীমা পলিসি সংক্রান্ত দ্বন্দ্ব (Dispute) নিস্পত্তির জন্য ব্যবহৃত হত। ১৭২০ সালে The Bubble Act. দু'টি বীমা কোম্পানীকে অনুমোদন দেয়। যথা: ১। Royal Exchange এবং ২। London Assurance. যারা, নৌ-বীমা কার্যক্রম পরিচালনা করত।

যুক্তরাজ্যের কফি হাউজ ব্যবসাও বীমার উন্নয়নে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখত। তার মধ্যে ১৬৮০ সালে এডুয়ার্ড লয়েড (Adward Lloyd) উল্লেখযোগ্য; যেখানে বণিকগণ যাতায়ত করত। সেখানে জাহাজ নিলামে বিক্রি হতো ও বীমা কার্যক্রম পরিচালিত হতো। এটা ১৭০০ শতাব্দীর শেষ ভাগ ও ১৮০০ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পৃথিবীর সর্বাপেক্ষা শক্তিশালী ও নির্ভরশীল বীমা কোম্পানীতে রুপান্তর হয়। ১৯০৬ সালে নৌ-বীমা আইন প্রবর্তন হয় যা আমাদের দেশেও প্রচলিত আছে।

অগ্নি-বীমা (Fire Insurance)

অগ্নি-বীমা ২য় সস্তরে উৎপত্তি লাভ করে। যারা নৌ-বীমা শুরু করেন তারাই পরবর্তীতে অগ্নি-বীমার জন্য হস্ত প্রসারিত করেন। ১৬৬৬ সালে বৃটেনে মহা অগ্নিকান্ডে, অগ্নি-বীমার প্রয়োজনীয়তার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। তখন ৭টি অগ্নি বীমা কোম্পানী যাত্রা শুরু করে। বিশেষত: শিল্প বিপ্লবের পর থেকে অগ্নিবীমার প্রয়োজনীয়তা আরও বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং আরও নতুন নতুন বীমা কোম্পানীর গোড়াপত্তন হয়। ১৮৬১ সালের Tooley Street Fire অগ্নি-বীমা প্রসারে আরও প্রসারিত করে এবং অগ্নিবীমার ক্ষেত্রে ঝুঁকির শ্রেণীবিভাগের প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করতে সহায়তা করে। পরে ১৮৬৮ সালে Fire Offices Committee (FOC) স্থাপিত হয়; যা বহুমুখী দায়িত্ব পালন করে, তার মধ্যে ইউনিফর্ম রেটিং, পরিসংখ্যান, এবং সদস্য কোম্পানীগুলোকে বিভিন্ন টেকনিক্যাল উপদেশ দেয়। পরবর্তীতে অনুরূপ আরও সংগঠন গড়ে উঠে। যেমন: যৌথ অগ্নি গবেষণা সংগঠন, স্যালভেজ কর্পোরেশন ইত্যাদি যারা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে বীমা ব্যবসায়ের বিজ্ঞানভিত্তিক প্রসার ও উন্নয়ন ঘটাতে সহায়তা করে আসছে।

জীবন বীমা (Life Insurance)

বীমা প্রসারের ৩য় ধাপে জীবন বীমার গোড়াপত্তন হয়। ইতিহাস থেকে দেখা যায় ১৫৮৩ সালে জীবন বীমা শুরু হয়। তখন স্বল্প মেয়াদী জীবন বীমা পলিসি ইস্যু করা হতো; যাতে কারো মৃত্যু হলে বীমাকৃত টাকা প্রদান করা হতো। আর পলিসিকাল পর্যন্ত বেঁচে থাকলে কোন টাকা দেয়া হতো না। ক্ষতিপূরণের পরিমাণও পূর্ব নির্ধারিত ছিল না বরং ক্ষতিপূরণের পরিমাণ নির্ভর করত মজুত তহবিলের পরিমাণের উপর।

তখন জীবন বীমা কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত ছিলনা এবং কোন মৃত্যুহার পঞ্জিও ছিল অনুপস্থিত। জীবন বীমা ব্যবসা পরিচালনার জন্য তেমন কোন মজবুত আইনও প্রবর্তন হয়নি।

১৬৯৩ সালে প্রথমবারের মত Halley মৃত্যুহার পঞ্জি টেবিল প্রবর্তন করে। যার দ্বারা মৃত্যুর ঝুঁকি মূল্যায়ন সম্ভব হয়। পরবর্তীতে Dodson প্রমাণ করেন যে, কোন জীবন বীমা পলিসির সমহারে প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা সম্ভব। ১৭৭৪ সালে বৃটেনের আইন পরিষদে জীবনবীমার আইন পাশ হয়; যেখানে বিশেষ করে বীমাযোগ্য স্বার্থ জীবনবীমার পলিসি গ্রহণের ক্ষেত্রে অপরিহার্য শর্ত আরোপিত হয়। এভাবেই জীবনবীমা একটি শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়।

দুর্ঘটনা বীমা (Accident Insurance)

বীমা উন্নয়নের সর্বশেষ ধাপ হলো দুর্ঘটনা বীমা ব্যবসা, যা নৌ-বীমা, অগ্নী-বীমা, ও জীবন বীমা দ্বারা কাভার করে না। দুর্ঘটনা বীমার মধ্যে বক্তিগত দুর্ঘটনা, সিধেল চুরি, শ্রমিকদের ক্ষতিপূরণ, দায় বীমা পলিসি, মটর, শস্য, গবাদি পশু, নগদ টাকার নিরাপত্তা, বন্ড, ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম, এ্যভিয়েসন ইত্যাদি অন্তর্ভুক্ত। দুর্ঘটনা বীমা মূলত ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমা দিয়ে যাত্রা শুরু করে। ১৯ শতকে শিল্প বিপ্লব, বিশেষ করে বাষ্পীয় ইঞ্জিন ও রেলওয়ের উদ্ভাবনের ফলে মৃত্যু ও শারীরিক জখমের পরিমাণ

বেড়ে যাবার ফলে দুর্ঘটনা বীমার প্রয়োজনীয়তা বাড়তে থাকে। যার ফলে কিছু বীমা কোম্পানী নৌ, জীবন ও অগ্নীবীমার পাশাপাশি দুর্ঘটনাবীমা ব্যবসা চালিয়ে যেতে থাকে। ব্যক্তিগত দুর্ঘটনার পাশাপাশি অন্যান্য দুর্ঘটনাতেও বীমার প্রসার লাভ করতে থাকে।

বাংলাদেশে বীমা ব্যবসার উন্নয়ন (Development of Insurance Business in Bangladesh)

বাংলাদেশে বীমা ব্যবসা নতুন নয়। এদেশে বীমা ব্যবসায়ের দীর্ঘ ইতিহাস রয়েছে। মূলত: বৃটিশ আমল থেকেই বীমা ব্যবসার প্রচলন হয়। এ উপমহাদেশে Clauson Committee এর সুপারিশ অনুযায়ী ১৯২৮ সালে ÒThe Indian Insurance Companies Act" নামে একটি বীমা আইন প্রণয়ন করা হয়; যা ১৯৩৮ সালে পরিবর্তন, পরিমার্জন ও সংযোজন হয়ে পূন:ঘোষিত হয়।

১৯৪৭ সালে দেশ ভাগ হবার পর তদানিন্তন পাকিস্থানে উক্ত বীমা আইন কর্যকর করা হয়। তবে ১৯৫৪ ও ১৯৫৮ সালে কিছু সংশোধন করা হয়। ভারতে ১৯৫৭ সালে বীমা ব্যবসায় রাষ্ট্রীয়করণ করা হলেও তৎকালীন পকিস্তানে তা ব্যক্তি মালিকানাধীনই থেকে যায়।

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হবার পর বীমা ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনা হয়। ১৯৭২ সালের রাষ্ট্রপতির ৯৫নং আদেশ বলে দেশের সকল বীমা কোম্পানীগুলোকে জাতীয়করণ করা হয়। তখন দেশে ৭৫ টি বীমা কোম্পানী চালু ছিল। সবগুলো বীমা কোম্পানীকে ৫ টি কর্পোরেশনের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যথা: ১। বাংলাদেশ জাতীয় বীমা কর্পোরেশন, ২। কর্নফুলী বীমা কর্পোরেশন, ৩। তিস্তা বীমা কর্পোরেশন ৪। সুরমা জীবন বীমা কর্পোরেশন ও ৫। রুপসা জীবন বীমা কর্পোরেশন। জাতীয় বীমা কর্পোরেশন Underwriting Corporation হিসেবে কাজ করত না। এটা ছিল কেন্দ্রীয় কর্পোরেশন, যার মূল দায়িত্ব ছিল অন্যান্য বীমা কর্পোরেশন গুলোর তদারকী ও নিয়ন্ত্রনের কাজ; তিস্তা ও কর্নফুলীর দয়িত্ব ছিল সাধারণ বীমা কার্যক্রম পরিচলনা করা এবং সুরমা ও রূপসা বীমা কর্পোরেশন মূলত জীবন বীমা ব্যবসা পরিচালনা করত।

পরে ১৯৭৩ সালের ১৪ই মে 'বীমা কর্পোরেশন অধ্যাদেশ' ঘোষণা করা হয় এবং উক্ত পাঁচটি বীমা কর্পোরেশনকে ২ টি কর্পোরেশনে রুপান্তর করা হয়। যথা: ১। জীবন বীমা কর্পোরেশন ও ২। সাধারণ বীমা কর্পোরেশন।

কিন্তু, রাষ্ট্রায়ত্ত জীবন বীমা কর্পোরেশন ও সাধারণ বীমা কর্পোরেশন তাদের প্রশাসনিক, ব্যবস্থাপনা ও সাংগঠনিকভাবে তেমন দক্ষতার স্বাক্ষর রাখতে ব্যর্থ হয়। কথায় আছে সরকারকা মাল দরিয়ামে ঢাল। ফলে পরবর্তীতে ব্যক্তি মালিকানাধীন বীমা কোম্পানী যেমন ১। বাংলাদেশ জেনারেল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লি: ২। পিপল্স ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লি: ৩। গ্রীন ডেল্টা ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লি: ৪। বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ কোম্পানী লি: ৫। ইউনাটেড ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লি: ৬। পপুলার ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী ৭। প্রগতি জেনারেল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লি: ৮। কর্নফুলী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লি; ৯। পূবালী ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লি: ১০। সেন্ট্রাল ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লি: ১১। ফিনিক্স ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লি: ১২। রিলায়েন্স ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লি: ইত্যাদি।

জীবন বীমার ক্ষেত্রে ব্যক্তি মালিকানা বীমা কোম্পানীগুলো হলো:
১। ন্যাশনাল লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লি:
২। ডেল্টা লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লি:
৩। সন্ধানী লাইফ ইন্স্যুরেন্স কোম্পানী লি:

বাংলাদেশে বর্তমানে কিছু ইসলামী বীমা কোম্পানীও ব্যবসা পরিচলনা করে আসছে। যেমন, ফারইষ্ট ইসলামী বীমা কোম্পানী, প্রাইম ইসলঅমী লাইফ ইন্স্যুরেন্স ইত্যাদি। ইসলামী শরীয়াহ আইন অনুযায়ী এই বীমা ব্যবসা পরিচালিত হচ্ছে। বাংলাদেশে বিদেশী বীমা কোম্পানী যেমন আমেরিকান লাইফ ইন্সরেন্স কোম্পানীও ব্যবসা পরিচালনা করছে।

তাই বলা যায়, বাংলাদেশে বীমা ব্যবসা সরকারী বেসরকারী, বিদেশী এমনকি ইসলামী বীমা কোম্পানীগুলো পাশাপাশি কাজ করে যাচ্ছে। তাই এদেশে বীমা ব্যবসা এক শক্তিশালী অবস্থান গড়ে তুলতে সক্ষম হচ্ছে যা অর্থনীতির চাকাকে আরও গতিশীল করে তুলতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। বীমার ব্যবসায়ের বি-রাষ্ট্রীকরণ এনে দিয়েছে এক অভূতপূর্ব সাফল্য। বাংলাদেশে বীমা ব্যবস্থাকে প্রসার ও গতিশীল করার জন্য বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমী প্রবর্তিত হয়। এবার আসুন এ প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রম নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা করি।

বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমি (Bangladesh Insurance Academy)

১৯৭২ সালে বাংলাদেশের সব বীমা কোম্পানীগুলো রাষ্ট্রীয়করণ করা হয়। জাতীয়তাকরণ করার পেছনে মূল উদ্দেশ্য ছিল সামাজিক সেবা ও জনগণের স্বার্থ সংরক্ষণ করা। তদানিন্তন পূর্ব পাকিস্তানের বেশীর ভাগ বীমা কোম্পানীগুলোর মালিক ছিল পশ্চিমারা, যারা এদেশে বীমা ব্যবস্থাকে দক্ষ ও শক্তিশালী করার জন্য খুব কমই নজর দেয়। যার ফলে বাংলাদেশের বীমা কোম্পানীগুলো পরিচালনার জন্য একাধিক সমস্যার সম্মখীন হয়। যার মধ্যে দক্ষ ও যোগ্য লোকের অভাব দারুণভাবে পরিলক্ষিত হয়। তাই ক্রমবর্ধমান চাহিদা ও অধিকতর সেবা নিশ্চিত করার জন্য বাংলাদেশ সরকার ১৯৭৩ সালে বাংলাদেশ ইন্সিরেন্স একাডেমীর প্রবর্তন করেন, যা নিম্ন লিখিত উদ্দেশ্য অর্জনের জন্য গঠিত হয়েছিল।

১. বীমা ক্ষেত্রে উন্নয়ন, সংগঠন ও পেশাগত বিদ্যাদানের জন্য বীমার উপর ডিগ্র, ডিপ্লোমা, ও সার্টিফিকেট প্রদান।
২. দেশে বীমা ব্যবসার প্রসার ঘটানোর জন্য গবেষণা পরিচালনা করা।
৩. বীমা পেশার সাথে জড়িত ব্যক্তিদের জন্য ইন-সার্ভিস শিক্ষণের ব্যবস্থা করা।
৪. বীমা বিষয়ের উপর প্রকাশনার জন্য উৎসাহ দান ও সুবিধা প্রদান করা।
৫. বীমার সাথে সম্পৃক্ত দেশীয় ও বিদেশীয় সংগঠনের সাথে সম্পর্ক স্থাপন ও ঘনিষ্ট যোগাযোগ রক্ষা করা।
৬. বীমা পেশার উপর বিভিন্ন ডিগ্রী, ডিপ্লোমা, ও সার্টিফিকেট পাবার জন্য কোচিং সুবিধা প্রদান।
৭. যারা বীমা ব্যবসায় ও শিক্ষা ক্ষেত্রে অসাধারণ অবদান রাখবে তাদের উৎসাহিত করার জন্য বিভিন্ন পুরুস্কার ও পদক প্রদান করা।

বীমার প্রকৃতি (Nature of Insurance)

প্রতিটি কার্যক্রমেরই কম বেশী নিজস্ব ও স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য আছে যা একটি অন্যটি থেকে আলাদা বা পৃথকভাবে চিহ্নিত করা যায়। তেমনি বীমারও কিছু স্বতন্ত্র প্রকৃতি বা বৈশিষ্ট্য রয়েছে যা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১. ঝুঁকির ভাগাভাগিকরন (Sharing of risk): বীমা হলো একটি ঝুঁকি বন্টনের প্রক্রিয়া, যা একজন ব্যক্তি বা একটি পরিবারের উপর বর্তায়। ধরুন, জনাব আ: করিম একজন প্রধান উপার্জনকারী ব্যক্তি। তিনি হঠাৎ করে মরে গেলেন। সেক্ষেত্রে জনাব করিমের পরিবার অর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়লেন। কিন্তু, যদি জনাব আ: করিমের একটি জীবন বীমা করা থাকে, তাহলে বীমা কোম্পানী এ আর্থিক ঝুঁকি গ্রহণ করত। তার বিনিময়ে জনাব আ: করিমকে কতগুলো নির্দিষ্ট বীমা সেলামী প্রদানের মাধ্যমে ঝুঁকি হস্তান্তর করতে পারেন। তখন বীমা কোম্পানী তার অন্যান্য গ্রাহক থেকে যে মোট প্রিমিয়াম বা সেলামী গ্রহণ করছে তা থেকে জনাব করিমের পরিবারকে আর্থিক সাহায্য দেয়া হবে। এভাবে জীবনবীমাসহ নৌ-বীমার মাধ্যমে সামদ্রিক ঝুঁকি, অগ্নি-বীমার মাধ্যমে সম্পদের ঝুঁকি ও দুর্ঘটনা বীমার মাধ্যমে অন্যান্য আকস্কিক ঝুঁকি সকলের মধ্যে ভাগাভাগি করে নেওয়া হয়।

২. বীমা একটি সমবায় পন্থা (Insurance is a cooperative device): মূলত বীমার জন্মই হলো সমেবত ও পারস্পরিক সহযোগিতা ও কল্যাণের জন্য। বীমার মাধ্যে এক বড় জনগোষ্টি তাদের জীবন, সম্পদ, নৌ ও দুর্ঘটনার ঝুঁকি এড়াতে একত্রিত হয়, চুক্তি বদ্ধ হয়। যাতে করে কোন বিষয়ে আর্থিক ক্ষতি হলে তারা তা পরস্পর ভাগাভাগি করে নেয়। একজন বীমাকারীর পক্ষে ক্ষতির পুরো টাকা তার নিজ তহবিল থেকে পরিশোধ করা অসম্ভব। তাই একজন বীমাকারী অনেক ব্যক্তিকে বীমার আওতায় এনে তাদের থেকে সংগৃহীত প্রিমিয়াম থেকে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে থাকে। অন্যান্য সমবায়ের মত বীমার ক্ষেত্রেও কোন ব্যক্তির জন্য বীমাপত্র গ্রহণ করা বাধ্যতামূলক নয়। এটা সম্পূর্ণ সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল।

৩. ঝুঁকি মূল্যায়ন (Valuation of risk): কোন নির্দিষ্ট বীমা পত্রের জন্য বীমা প্রিমিয়ামের টাকার পরিমাণ নির্ধারণের পূর্বে উক্ত বিষয়বস্তুর ঝুঁকির পরিমাণ মূল্যায়ন করা হয়। ঝুঁকি মূল্যায়নের জন্য বিভিন্ন পদ্ধতি রয়েছে। তাই ঝুঁকির সম্ভাবনার উপর প্রিমিয়ামের পরিমাণ নির্ভর করে। ধরুন জীবন বীমাপত্র গ্রহণের ক্ষেত্রে বয়স একটি গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। যার যত বয়স বেশী, তার মৃত্যুর ঝুঁকিও তত বেশী । তাই প্রিমিয়ামের পরিমাণও বেশী হবে।

৪. চুক্তিমত দাবী পরিশোধ (Payment at Contingency): বীমা একটি চুক্তি। বীমা চুক্তি অনুসারে ঘটনা ঘটলে শুধু বীমার দাবী পরিশোধ করা হয়। জীবন বীমার ক্ষেত্রে মৃত্যু অথবা মেয়াদ উত্তীর্ণ হলে, এবং অন্যান্য বীমার ক্ষেত্রে চুক্তি মোতাবেক ঘটনা ঘটলেই কেবল মাত্র বীমার দাবী পরিশোধ করা হবে, নতুবা নয়। জীবন বীমা ব্যাতিত অন্যান্য বীমাগুলো অনিশ্চিয়তার চুক্তি।

৫. পরিশোধের পরিমান (Amount of Payment): বীমার দাবী পরিশোধের পরিমাণ ক্ষতির পরিমাণের উপর নির্ভরশীল। ক্ষতি বেশী হলে, ক্ষতিপূরণের পরিমাণও বেশী হবে, আবার ক্ষতির পরিমাণ কম হলে দাবী পরিশোধের পরিমাণও কম হবে। বীমা একটি ক্ষতিপূরণের চুক্তি। বীমার মাধ্যমে কাউকে লাভ করতে দেয়া হবে না । কিন্তু, জীবন বীমার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম।

কারণ, মানুষের জীবনের মূল্য টাকার অংকে পরিমাপ করা যায় না। তাই জীবন বীমা পলিসিতে যে পরিমাণ টাকার কথা উল্লেখ থাকে, মৃত্যু হলে বা মেয়াদ পার হলে সে পরিমাণ টাকাই পরিশোধ করতে হয়। কিন্তু, অন্যান্য বীমার ক্ষেত্রে ক্ষতির পরিমাণের উপর দাবী পরিশোধের পরিমাণ নির্ভর করে। সেক্ষেত্রেও যে পরিমাণ টাকার বীমাপত্র গ্রহণ করা হবে তার থেকে ক্ষতি বেশী হলেও বীমাকৃত টাকার বেশী দেয়া হবে না।

৬. নিশ্চয়তা দান (Giving Assurance): মানুষের জীবন প্রতিটি ক্ষেত্রেই অনিশ্চয়তায় ভরপুর যা, মানুষের চলার পথকে করে মন্থর। কিন্তু, বীমা মানুষের জীবনের বিভিন্ন কর্মকান্ডে নিশ্চয়তা প্রদান করে; ফলে, মানুষ নির্ভাবনায় তার সকল কর্মকান্ড চালাতে পারে। তাই, বীমা অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে যেখানে যেমন প্রয়োজন সেখানে তেমন নিশ্চয়তা প্রদান করে মানুষকে করে গতিশীল, আর অর্থনীতির চাকাকে রাখে সচল।

৭. ঝুঁকির বিরুদ্ধে প্রতিরক্ষা (Protection Against Risk): মানুষের জীবন ও সম্পদের ঝুঁকির বিরুদ্ধে বীমা নিরাপত্তা নিশ্চিত করেছে। তাই বীমার ফলে সম্পদের ক্ষতি হলে তা বীমা কোম্পানী পুসিয়ে দিচ্ছে। আর কোন উর্পাজনক্ষম মানুষের অকালে মৃত্যু হলে, তার পরিবার যে আর্থিক অনিশ্চয়তার মধ্যে পড়ে, তার পাশে বীমা কোম্পানী আসে সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে। ফলে, জীবন ও সম্পদের অনিশ্চয়তার অনেকাংশে নিশ্চয়তা প্রদান করে বীমা ব্যবস্থা।

৮. বিপুল সংখ্যক নীতি অনুসরণ (To Follow the Principles of Large Number): একজন বীমাকারী নীতিগতভাবে বিচিত্র ধরনের বিষয়ের উপর বীমার ঝুঁকি গ্রহণ করে থাকে। তাদের সংখ্যা যেমন অনেক, তেমনি বৈচিত্রময়। তাই এ বিচিত্র ধরনের বহুসংখ্যক বিষয়ে যে বীমা গ্রহণ করা হচ্ছে তার ঝুঁকি বন্টন করার জন্য বহুসংখ্যক নীতি অনুসরণ করতে হয়। যেহেতু, বিষয়বস্তু ও ঝুঁকি বিভিন্ন ধরনের, তাই তা সুষ্ঠু ব্যবস্থাপনার জন্য বিপুল সংখ্যক নীতি অনুসরণ করা প্রয়োজন হয়।

৯. বহুসংখ্যক বীমা গ্রহীতা (Large Number of Insured Person): বীমার ঝুঁকি বন্টন করতে বহুসংখ্যক লোকের প্রয়োজন হয়। বীমা গ্রহীতার সংখ্যা যত বেশী হবে ঝুঁকির পরিমাণও তত কম হবে, আবার বীমা গ্রহীতার সংখ্যা কম হলে ঝুঁকির পরিমাণও বেশী হবে। তাই একজন বীমাকারী বহুসংখ্যক লোককে বীমার আওতায় আনার প্রয়াস চালায়।

১০. বীমা কোন জুয়াখেলা নয় (Insurance is not Gambling): বীমা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এটা আইন দ্বারা বৈধ। কিন্তু জুয়াখেলা অনিশ্চয়তার খেলা, যা কোন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সহায়তা করে না, বরং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বিমুখ। এটা অবৈধ ও অনৈতিক। জুয়াখেলায় ঝুঁকি গ্রহণ করে উভয় পক্ষ, কিন্তু বীমা একজন গ্রাহকের ঝুঁকি কমায়। এবং একজনের ঝুঁকিকে অন্যান্য সবার মধ্যে বন্টণ করার ব্যবস্থা করে। তাই বীমা জুয়ার বিপরীত।

১১. বীমা কোন দাতব্য বিষয় নয় (Insurance is not a Matter of Charity): দাতব্য বিষয় কোন প্রতিদান ব্যতিত করা হয়। কিন্তু, বীমার ক্ষেত্রে প্রতিদান প্রয়োজন হয়। কারণ, বীমা একটি চুক্তি। আর চুক্তির একটি অপরিহার্য উপাদান হলো প্রতিদান। বীমা মানুষ ও তাঁর সম্পদের নিরাপত্তাদান করে বটে, কিন্তু তার বিনিময়ে সে প্রতিদানস্বরূপ প্রিমিয়াম গ্রহণ করে। তাই বীমা একটি কল্যাণকর কাজ। তবে এটা একটি মূলত মুনাফা অর্জনকারী কল্যাণকর ব্যবসা।

পাঠ সংক্ষেপ: ৭.১

বীমার মূল কথা হলো ঝুঁকি হস্তান্তর করা। এতে দুটি পক্ষ থাকে, এক পক্ষ টাকার বিনিময়ে ঝুঁকি অন্যের নিকট হস্ড়ান্ড়র করে তাকে বীমা গ্রহীতা বলে। পক্ষান্ড়রে, যিনি টাকার বিনিময়ে ঝুঁকি গ্রহণ করেন তকে বীমাকারী বলা হয়। "বীমা চুক্তি হলো প্রিমিয়াম পরিশোধের প্রতিদানে এক পক্ষ কতৃক অপর পক্ষের উপর সম্ভাব্য ক্ষতির ঝুঁকি গ্রহণ সংক্রান্ত সম্মতি যা এরূপ অনেক ঝুঁকির দায়িত্ব গ্রহণের সাধারণ প্রকল্পের অংশ বিশেষ।" বীমা হলো একটি ঝুঁকি বন্টনের প্রক্রিয়া, যা একজন ব্যক্তি বা একটি পরিবারের উপর বর্তায়। মূলত বীমার জন্মই হলো সমেবত ও পারস্পরিক সহযোগিতা ও কল্যাণের জন্য। কোন নির্দিষ্ট বীমা পত্রের জন্য বীমা প্রিমিয়ামের টাকার পরিমাণ নির্ধারণের পূর্বে উক্ত বিষয়বস্তুর ঝুঁকির পরিমাণ মূল্যায়ন করা হয়। বীমা অনিশ্চয়তার বিরুদ্ধে যেখানে যেমন প্রয়োজন সেখানে তেমন নিশ্চয়তা প্রদান করে মানুষকে করে গতিশীল, আর অর্থনীতির চাকাকে রাখে সচল। জীবন ও সম্পদের অনিশ্চয়তার অনেকাংশে নিশ্চয়তা প্রদান করে বীমা ব্যবস্থা। বীমা অর্থনৈতিক উন্নয়ন ও উৎপাদনশীলতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে। এটা আইন দ্বারা বৈধ। কিন্তু জুয়াখেলা অনিশ্চয়তার খেলা, যা কোন অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে সহায়তা করে না, বরং অর্থনৈতিক কর্মকান্ড বিমুখ। এটা অবৈধ ও অনৈতিক। জুয়াখেলায় ঝুঁকি গ্রহণ করে উভয় পক্ষ, কিন্তু বীমা একজন গ্রাহকের ঝুঁকি কমায়। এবং একজনের ঝুঁকিকে অন্যান্য সবার মধ্যে বন্টণ করার ব্যবস্থা করে। তাই বীমা জুয়ার বিপরীত।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৭.১

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১. বীমার মূল কথা কী?
ক) ঝুঁকি হস্ড়ান্ড়র করা খ) ঝুঁকি বন্টন করা
গ) ঝুঁকি পুঞ্জিভূত করা ঘ) কোনটি নয়

২. বীমায় কয়টি পক্ষ থাকে?
ক) ১ টি খ) ২ টি
গ) তিনটি ঘ) ৪ টি

৩. বীমা চুক্তিতে একপক্ষ অপরপক্ষকে প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে যে অর্থ প্রদান করে তাকে কী বলে?
ক) বীমার ক্ষতিপূরণ খ) বীমা চুক্তি
গ) বীমা সেলামী ঘ) কোনটি নয়

৪. বীমা কী ধরণের পন্থা?
ক) সমবায় খ) সালিশী
গ) বিচারিক ঘ) প্রশাসনিক

৫. বীমা আইন দ্বারা ____ ।
ক) বৈধ খ) অবৈধ
গ) প্রক্রিয়াধীন ঘ) কোনটি নয়

পাঠ- ২ বীমার কার্যাবলী, বীমার গুরুত্ব ও বীমার শ্রেণীবিভাগ (Functions of Insurance, Importance and Classification of Insurance)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ বীমার বিভিন্ন কার্যাবলী বর্ণনা করতে পারবেন;
- ☞ বীমার গুরুত্ব ও ভূমিকা সম্পর্কে বলতে পারবেন; এবং
- ☞ বীমার শ্রেণীবিভাগ করতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

বীমার কার্যাবলী

বীমা বিভিন্ন ধারণের কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে। বীমার কার্যাবলীকে প্রধানত:দু'টি ভাগে ভাগ করা যায়: ১। প্রাথমিক কার্যাবলী ও ২। সহায়ক কার্যাবলী।

প্রাথমিক কার্যাবলী (Primary Function): বীমা নিম্নলিখিত প্রাথমিক কার্যাবলী সম্পাদন করে থাকে:

১) বীমা নিশ্চয়তা প্রদান করে (Insurance Provides Certainty): বীমা অনিশ্চিত ক্ষতি কাটিয়ে উঠার ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা প্রদান করে থাকে। সুষ্ঠু পরিকল্পনা ও প্রশাসনের মাধ্যমে অনিশ্চিয়তার ঝুঁকি কমানো সম্ভব। তবে এটা বেশ কষ্টকর ব্যাপার। তাই বীমা এই কঠিন দায়িত্ব থেকে মানুষকে দায়ভার লাঘব করে নিজে ঝুঁকি গ্রহণ করেছে। কোন আর্থিক ক্ষতিসাধান হলে, চুক্তি মোতাবেক ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা প্রদান করার বিনিময়ে বীমাকারী নির্দিষ্ট হারে প্রিমিয়াম নিয়ে থাকে।

২) বীমা সুরক্ষা প্রদান করে (Insurance Provides Protection): বীমার প্রধান ও প্রথম কাজ হলো সম্ভাব্য অনিশ্চিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। যেহেতু ক্ষতির পরিমাণ ও সময় অনিশ্চিত। তাই, কোন অর্থিক ক্ষতি হলে বা কোন উপার্জনক্ষম ব্যক্তির অকাল মৃত্যুতে তার পরিবার আর্থিক কষ্টের মধ্যে নিপতিত হয়। বীমা পলিসি গ্রহণ করা না থাকলে ব্যক্তিগত বা পারিবারিকভাবে এ ক্ষতির দায়ভার বহন করতে হয়। সেক্ষেত্রে বীমা এ ক্ষতিপূরণের জন্য নিশ্চয়তা প্রদান করে থাকে। বীমা ঝুঁকি কমাতে বা এড়াতে পারে না। কিন্তু কোন দুর্ঘটনার ফলে ক্ষতি হলে, বীমা ক্ষতিপূরণ করার ব্যবস্থা করে থাকে। এভাবে বীমা ঝুঁকি থেকে মানুষকে রক্ষা করে থাকে।

৩) ঝুঁকি বন্টন করে (Risk- Sharing): ঝুঁকি যেহেতু অনিশ্চিত তাই ঝুঁকি থেকে উদ্ভূত ক্ষতিরপরিমাণও অনিশ্চিত। তাই যখন ঝুঁকি সংঘঠিত হয়, তখন যে ক্ষতির উদ্ভব হয় তা, বীমাকৃত সকল ব্যক্তি ভাগাভাগি করে নেয়। সেজন্য বীমা গ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তি বীমাপত্র গ্রহণের জন্য একটি নির্দিষ্ট হারে প্রিমিয়াম প্রদান করে। বীমাকৃত বস্তুর ক্ষতি হলে, পুঞ্জিভূত প্রিমিয়াম তহবিল থেকে তা পূরণ করা হয়। এ ভাবে ঝুঁকিজনিত ক্ষতি বীমা গ্রহীতাগণ ভাগাভাগি করে নেয়। ফলে ক্ষতি কোন এক ব্যক্তি কতৃক বহন করতে হয় না।

বীমার সহায়ক কার্যাবলী (Secondary Functions of Insurance): বীমা কোম্পানী তাদের প্রাথমিক কার্য সম্পাদনের পাশাপাশি কিছু সহায়ক কার্যবলীও পালন করে থাকে, যা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১) ঝুকি প্রতিরোধ করণ (Prevention of Risk): ক্ষতির পরিমাণ কমাতে পারলে কম ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। কম ক্ষতিপূরণ দিতে হলে কম প্রিমিয়ামে বীমা গ্রহণ করার সুযোগ সৃষ্টি করতে হয়। ফলে বেশী লোক বীমার আওতায় আনা সম্ভব হয় বলে বীমা ব্যবসার প্রসার ঘটে। তাই বীমা কোম্পানী ঝুঁকি কমাতে মানুষকে প্রশিক্ষণ দেয়। যারা ঝুঁকি কমাতে সাহায্য করে, তাদেরকে যেমন: স্বাস্থ্য সংগঠন, অগ্নিনির্বাপনকারী সংগঠন সংশি- ষ্ট প্রতিষ্ঠানকে সাহায্য ও সহযোগিতাদান করে থাকে। ফলে ক্ষতির পরিমাণ কমে। এভাবে বীমা কোম্পানী ক্ষতি কমাতে সার্বিকভাবে সাহায্য করে থাকে।

২) বীমা মূলধন যোগান দেয় (Insurance Provides Capital): বীমা কোম্পানী প্রিমিয়াম সংগ্রহের মাধ্যমে প্রচুর পরিমাণ তহবিল সংগ্রহ করে থাকে, যা একবারে ক্ষতিপূরণ হিসেবে ব্যবহৃত হয় না। তাই, উদ্বৃত্ত টাকার একটি বিরাট অংশ উৎপাদনকারী ও আর্থিক প্রতিষ্ঠানে বিনিয়োগ বিনিয়োগ করা হয়ে থাকে। বীমা কোম্পানীগুলো দীর্ঘ মেয়াদী মূলধনের সবচেয়ে প্রধান উৎস। এভাবে ব্যবসা ও শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলো তাদের প্রয়োজনীয় মূলধনের একটি বড় অংশ বীমা কোম্পানীগুলো থেকে সংগ্রহ করে। বীমা কোম্পানীগুলো মূলধন সরবারহে ভূমিকা পালন করে থাকে।

৩) দক্ষতা উন্নয়নে সহায়তা করে (It Improves Efficiency): বীমাকারীর মৃত্যু বা ক্ষতি হলে আর্থিক ক্ষতিপূরণের নিশ্চয়তা প্রদান করে থাকে। ফলে একজন বিনিয়োগকারী,কর্মকর্তা ও কর্মচারীগণ নিশ্চিন্তে তাদের কর্মকান্ড পরিচালনা করতে পারে বিধায় তাদের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। কারণ, তাদের কোন অনিশ্চয়তা বা দুশচিন্তায় ভুগতে হয় না। যার ফলে, সকলের দক্ষতা বৃদ্ধিতে পরোক্ষ ভাবে বীমা কোম্পানী সহায়তা দান করে থাকে।

৪) অর্থনৈতিক উন্নয়নে সহায়তা করে (It Helps Economic Development): বীমা মানুষের জীবনের অনিশ্চয়তা, সম্পদের ক্ষতি, নৌ-বিপদ, মালিকের ক্ষতি, মটরজানের ক্ষতি ইত্যাদি থেকে রক্ষা করে থাকে। অথবা প্রয়োজনীয় মূলধনও সরবরাহ করে থাকে। ফলে দেশের অর্থনৈতিক চাকা স্বচল ও গতিশীল করতে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে সাহায্য করে থাকে। বীমার ফলে আজ মানুষ অনেক অর্থনৈতিক ঝুঁকি গ্রহণ করছে। এভাবেই বীমা একটি দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।

বীমার ভূমিকা ও গুরুত্ব
Role and Importance of Insurance

বীমা ব্যবসার মূল লক্ষ্যই হলো কোন ক্ষতি সাধন হলে তার পাশে এসে দাঁড়ান; সহযোগিতা করা নিরাপত্তা বিধান করা। তাই, বীমা একজন বিপদ-গ্রস্থ মানুষের পাশে এসে প্রকৃত বন্ধুর ভূমিকা পালন করে থাকে। বীমা ব্যবসা নিম্নলিখিত তিনটি ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ন ভূমিকা পালন করে:

একজন ব্যক্তির নিকট বীমার গুরুত্ব (Importance of Insurance to an Individual): একজন ব্যক্তি নিম্নলিখিতভাবে বীমার মাধ্যমে উপকৃত হয়:

১. বীমা নিরাপত্ত বিধান করে (Insurance Provides Security): বীমা মানুষের বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে। যেমন- জীবন বীমা অকাল মৃত্যুতে পরিবারের অর্থনৈতিক নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে। অগ্নি-বীমা সম্পদের নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে। নৌ-বীমা সামুদ্রিক ঝুঁকির নিরাপত্তা প্রদান করে। তাই বীমা ব্যবস্থা মানুষ ও তার সম্পদের নিরাপত্তা দান করে থাক।

২. বীমা মানুষের মনের শান্ড়ি দেয় (Insurance Provides Peace of Mind): বীমাপত্র গ্রহণের ফলে একজন মানুষ নিরাপদবোধ করে। ব্যবসায়ের ঝুঁকি কমে, ফলে সে ভাবনাহীন জীবন যাপন করতে পারে। এর ফলে অহেতুক ভবিষ্যতের অনিশ্চয়তার দুশচিন্তা থেকে মুক্ত থাকে। এর ফলে মনে এক অনাবিল শান্তি অনুভব করে।

৩. বীমা বন্ধকী সম্পত্তি রক্ষা করে (Insurance Protects, Mortgage Proparty): একজন বন্ধকদাতা হঠাৎ করে অকালে মৃত্যুবরণ করলে পরিবারবর্গ অর্থিক অনটনে পড়ে। যার ফলে, সংসার চালাতেই হিমশিম খেতে হয়। তাই বন্ধকী সম্পদ বন্ধক মুক্ত করা একেবারে অসম্ভব হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে জীবন বীমা পলিসি থাকলে বীমা কোম্পানী থেকে এককালীন মোটা অংকের টাকা পাওয়া যায়, যা থেকে বন্ধকী সম্পদ মুক্ত করা সম্ভব হয়। এভাবে বীমা বন্ধকী সম্পত্তি রক্ষায় সাহায্য করে থাকে।

৪. বীমা নির্ভরশীলতা দূর করে (Insurance Eliminates Dependency): কারো বাবা বা স্বামীর মৃত্যুতে ঐ পরিবার অসহায় সম্বলহীন হয়ে পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে, তাদের আর্থিকভাবে অন্যের উপর নির্ভরশীল হওয়া অপরিহার্য হয়ে পড়ে। সেক্ষেত্রে উক্ত মৃত ব্যক্তির জীবন বীমাপত্র থাকলে এককালীন বড় অংকের টাকা পায়, যার ফলে তাদের পরিবার আর্থিকভাবে স্বচ্ছল থাকে। তাদের আর্থিকভাবে পরনির্ভরশীল হতে হয় না। এভাবে বীমা নির্ভরশীলতা দূর করে থাকে।

৫. জীবন বীমা সঞ্চয়ে উৎসাহিত করে (Life Insurance Encourages Savings): জীবন বীমা মূলত নিশ্চয়তার বীমা। বীমা গ্রহীতার মৃত্যু হউক বা চুক্তির সময়সীমা পর্যন্ত বেঁচে থাকুক, সে আর্থিক অনুদান পাবেই। আর বীমা গ্রহীতার জন্য একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ড় বিভিন্ন কিস্ড়িতে প্রিমিয়াম বা বীমা সেলামী দিতে হয়। তাই মানুষ ভবিষ্যতে পাবার আশায় জীবন বীমার মাধ্যমে কিস্ড়িতে টাকা দিয়ে থাকে। এর ফলে, তার একটি বিরাট সঞ্চয় গড়ে উঠে, যা ভবিষ্যতে অর্থিক চাহিদা মিটাতে সক্ষম হয়। এভাবে জীবন বীমা সঞ্চয়ে মানুষকে উৎসাহিত করে থাকে।

৬. জীবন বীমা লাভজনক বিনিয়োগে সাহায্য করে (Life Insurance Provides Porfitable Investment): জীবন বীমায় যে প্রিমিয়াম জমা দেয়, সেটাকে বীমা কোম্পানী বিনিয়োগ করে তার লাভের অংশসহ বীমার দাবী পূরণ করে। তাই বীমা গ্রহীতা যখন টাকা ফেরত পায়, তখন লাভসহ তাকে দেওয়া হয়। তাই জীবন বীমা একটি লাভজনক বিনিয়োগ হিসেবে কাজ করে।

৭. জীবনবীমা একজন ব্যক্তির নানাবিধ অভাব পূরণ করে (Life Insurance Fulfills Different Needs of a Person): জীবনবীমা একজন ব্যক্তির নানাবিধ অভাব পূরণে সহায়তা করে থাকে। নিম্নে জীবন বীমা একজন ব্যক্তির যে সকল অভাব পূরণ করে তা বর্ণনা করা হলো:

ক. পারিবারিক অভাব (Family need) : অকাল মৃত্যুতে একটি পরিবার দারুণ অর্থকষ্টে পড়তে পারে। সেক্ষেত্রে প্রচুর টাকার প্রয়োজন পড়ে অথচ অর্থ উপার্যনের লোক থাকে না । সেক্ষেত্রে পরিবারবর্গ অন্যের করুণার পাত্র হয়ে চলতে হয়; যা কারোরই কাম্য নয়। বীমা ব্যবস্থা চালুর ফলে যদি জীবনবীমা করা থাকে, সেক্ষেত্রে এ অর্থনৈতিক সংকটের সময় ক্ষতিগ্রস্থ পরিবারের পাশে বীমা এসে দাঁড়ায়। ফলে পরিবারের আর্থিক অভাব অনেকাংশে দূর হয়। এভাবেই বিশেষ করে জীবন বীমা পরিবারের আর্থিক অভাব পূরণে ভূমিকা পালন করে।

খ. বৃদ্ধ বয়সের প্রয়োজন (Old-age Need): বৃদ্ধ বয়সে মানুষের অনেক টাকার প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে আবার মানুষের আয়ও অনেক কমে যায়। ফলে পরিবারবর্গ নিয়ে অনেক সময় অভাবে পড়তে হয়। বিশেষ করে, যদি পর্যাপ্ত সম্পদ বা উপার্জনক্ষম কোন ব্যক্তি না থাকলে অভাবের সীমা থাকে না । এক্ষেত্রে জীবনবীমার বিভিন্ন পলিসি আর্থিক অভাব দূর করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করে।

গ. সমন্বয় জনিত প্রয়োজন (Readjustment Need): অকাল মৃত্যু, চাকুরীচ্যুতি, অক্ষমতা প্রভৃতি কারণে মানুষের আয় কমে যায়। ফলে জীবন যাত্রার মানও কমাতে বাধ্য হয়। সে ক্ষেত্রে জীবনযাত্রার মান ঠিক রাখার জন্য আয়ের সমন্বয় প্রয়োজন হয়। এক্ষেত্রে জীবন বীমা সহায়ক ভূমিকা পালন করতে পারে।

ঘ. বিশেষ অভাব (Special Need): অনেক পরিবারেই বিশেষ কতগুলো অভাব রয়েছে, যা পূরণ করতে পরিবারের সদস্যদের হিমসিম খেতে হয়। যদি উপার্জনক্ষম ব্যক্তির পর্যাপ্ত আয় না থাকে, সেক্ষেত্রে এ অভাবগুলো পূরণ করা কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে, পরিবারকে কষ্ট ভোগ করতে হয়। পরিবারের বিশেষ ধরণের অভাবগুলো নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১) শিক্ষার জন্য অভাব (Need for Education): বীমা এবং বার্ষিক বৃত্তির কতগুলো বীমা পত্র (Insurance Policy) আছে। কারোর বাবা বা অভিভাবকের অকাল মৃত্যুতে বাচ্চাদের শিক্ষা কার্যক্রম ব্যহত হয়। এক্ষেত্রে বাচ্চাদের শিক্ষাবীমা শিক্ষার জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের অভাব পূরণ করতে সাহায্য করে।

২) বিবাহ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন (Need for marige): অনেক সময় অবিবাহিতা মেয়ের বিয়ের জন্য প্রচুর টাকার প্রয়োজন হয়; যা একজন সাধারণ মানুষের স্বাভাবিক আয় দ্বারা পূরণ করা সম্ভব হয় না। সেক্ষেত্রে বিশেষ ধরনের বীমা ব্যবস্থার মাধ্যমে এ ধরনের সমস্যার সমাধান করা যায়।

৩) বাচ্চাদের প্রতিষ্ঠা দানের জন্য বীমার প্রয়োজন (Insurance Need for Settlement of Children): বাচ্চাদের লেখাপড়া শেষ করে বাচ্চাদের নিজের পায়ে দাঁড়াতে সময় প্রয়োজন হয়। সেক্ষেত্রে বীমাকারী আর্থিক সহযোগিতা করে বাচ্চাদেরকে লেখাপড়া শেষ করার পর ভালো অবস্থানে পৌঁছার আগ পর্যন্ত আর্থিক অভাব দূর করতে সাহায্য করে।

৪) ক্লিন আপ নিড (Clean up Need): মৃত্যুর পর কবরস্ত করা, সম্পদ ও আয়ের কর বাবদ প্রচুর টাকার প্রয়োজন হয়, যা পূরণ করতে অনেক টাকার প্রয়োজন হয় এবং তাতে পরিবারের তহবিল কমে যায়। বীমা এ ধরনের খরচ মেটাতে এগিয়ে আসে।

একজন ব্যবসায়ীর নিকট বীমার গুরুত্ব
Importance of Insurance to a Businessman

ব্যবসায়ীক সমাজও বীমার দ্বারা অনেকভাবে লাভবান হতে পারে যা নিম্নরূপ:

১) ব্যবসায়িক ক্ষতির অনিশ্চয়তা কমায় (Uncertainty of Business Loss is Reduced): ব্যবসায়ে ঝুঁকি অত্যন্ত বেশী। ব্যবসায়ের ঝুঁকির ফলে সফলতা অনিশ্চিত হয়ে যায়। যে কোন দুর্ঘটনা ব্যবসায়ের সম্পদ ধ্বংশ হয়ে ব্যবসায়ের চাকা বন্ধ হয়ে যেতে পারে। একজন ব্যবসায়ীর জীবন ও স্বাস্থ্যর কোন নিশ্চয়তা নেই, যার ফলেও ব্যবসায়ের সফলতা অনিশ্চত হয়ে যায়। এসকল ঝুঁকির ফলে ব্যবসায়ের যে ব্যাপক ক্ষতি সাধন হতে পারে, তা বীমার মাধ্যমে অনেকাংশে পুশিয়ে নিতে পারে।

২) বীমা ব্যবসায়ের দক্ষতা বৃদ্ধিতে সহায়তা করে (Insurance Help in Improvement of Efficiency): বীমার ফলে ব্যবসায়ীগণ নির্ভাবনায় ব্যবসায়ের কার্যক্রম চালাতে পারে। ফলে ব্যবসায়ের কাজে বেশী মনোনিবেশ করতে পারে, যার দরুন

ব্যবসায়ের দক্ষতা বৃদ্ধি পায়। যেহেতু ঝুঁকি বীমা কোম্পানীগুলো বহন করছে; তাই, ব্যবসায়ীগণ নতুন নতুন ব্যবসায়ে আরও উদ্যমতার সাথে পরিচালনা করতে পারছে।

৩) ঋণের সুবিধা বৃদ্ধি (Enhancement of Credit): বীমা কোম্পানীগুলো প্রিমিয়ামের মাধ্যমে অনেক টাকার তহবিল গঠন করে, যা এক সাথে প্রয়োজন হয় না। তাই, তারা দীর্ঘ মেয়াদে ব্যবসায়ীদের ঋণ হিসেবে বিনিয়োগ করে থাকে। এ ভাবে বীমা কোম্পানীগুলো দীর্ঘমেয়াদী ঋণের একটি বড় উৎস হিসেবে কাজ করে। এছাড়া বমিা পলিসি ঋনগ্রহীতার রায় গ্রহণ যোগ্যতা ও ক্ষমতা বৃদ্ধি করে।

৪) ব্যবসায়ের ধারাবাহিকতা রক্ষা (Business Continuation): বিশেষত: অংশীদারী ব্যবসায়ে কোন অংশীদার মৃত্যুবরণ করলে ব্যবসা বন্ধ হয়ে যায়। কিন্তু, বীমা ব্যবস্থা চালুর ফলে কোন অংশীদারের মৃত্যু হলে বীমা কোম্পানীর নিকট থেকে প্রচুর টাকা পায়। ফলে মূলধনের অভাব হয় না, যার ফলে ব্যবসায়ের ধারাবহিকতা বজায় রাখা সম্ভব হয়। আবার সম্পদের বীমার মাধ্যমে বিভিন্ন ধরণের বিপর্যয় থেকে ব্যবসাকে রক্ষা করা যায়।

৫) শ্রমিকদের কল্যাণ (Welfare of Employees): একজন মালিকের শ্রমিকদের কল্যাণ সাধন করা অপরিহার্য দায়িত্ব। সেক্ষেত্রে গোষ্ঠী বীমার মাধ্যমে শ্রমিকদের আর্থিক সহায়তা করা যায়। অন্যান্য বীমা যেমন; জীবন বীমা, দুর্ঘটনা বীমা ও চিকিৎসা বীমার মাধ্যমেও শ্রমিকদের আর্থিক কল্যাণসাধন সম্ভব। এভাবে বীমার মাধ্যমে শ্রমিক-কর্মচারী আর্থিকভাবে লাভবান হতে পারে।

বীমার সামাজিক গুরুত্ব (Importance of Insurance to the Sociaty)

বীমার বিভিন্ন সামাজিক গুরুত্ব রয়েছে যা নিচে বর্ণনা করা হলো:

(১) সমাজের সম্পদের রক্ষা হয় (Wealth of the Society is Protected): বীমার মাধ্যমে সমাজের সম্পদের ক্ষতি থেকে রক্ষা করা হয়। যেমন জীবন বীমা মানব সম্পদের ক্ষতি আর্থিকভাবে পূরণ করে থাকে। মানুষ যদি ভাবনাহীন শিক্ষিত ও শক্তিশালী হয়, তবে বেশী আয় করতে সক্ষম হয়। তেমনি ভাবে অগ্নিকান্ড, দুর্ঘটনা ইত্যাদি ক্ষতিপূরণ বীমার মাধ্যমে প্রদান করা হয়। গবাদী পশু, শষ্য, মুনাফা ও মেশিন পত্র বীমার মাধ্যমে নিরাপত্তা বিধান করে অর্থনৈতিক ক্ষতি কমান সম্ভব হয়। সভ্যতার অগ্রগতির সাথে সাথে বেশী ঝুঁকিপূর্ণ কর্মকান্ডেরও প্রসার লাভ করেছে। ফলে নতুন নতুন বীমার উদ্ভব হয়েছে, সকল কর্মকান্ড নির্ভাবনায় পরিচালনার জন্য বীমার আওতা দিন দিন প্রসারিত হচ্ছে। সমাজের প্রায় প্রতিটি জায়গাতেই বীমার বিচরণ। বর্তমান, ভবিষৎ ও কর্মক্ষম মানব সম্পদের নিরাপত্তা বিধান করা হয়েছে। শিশুরা বিশেষায়িত জ্ঞান লাভের সুযোগ পাচ্ছে, শ্রমজীবিরা ভাবনা হীন জীবন ও বয়স্ক লোকেরা বীমার মাধ্যমে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা পাচ্ছে। তাই বীমার সুবিধায় সমাজের সর্বত্র শান্ড়ি ও অগ্রগতির ছোয়া লেগে চলেছে।

(২) দেশের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি (Economic Growth of the Country): যে কোন দেশের অর্থনৈতিক উন্নয়নে বীমা এক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখে চলেছে। বীমা সম্পদের ক্ষতি থেকে নিরাপত্তা বিধান করছে এবং ব্যবসায়ে প্রয়োজনীয় অর্থ যোগান দিচ্ছে। কৃষি থেকে শুরু করে ব্যবসা বাণিজ্যে বীমা নিরাপত্তার ব্যবস্থা করে নিরবিচ্ছিন্ন উৎপাদন অব্যাহত রেখেছে। শিল্প কারখানার মেশিন, আসবাবপত্র, কাঁচামাল, কর্মচারীর নিরাপত্তা বিধান করে অর্থনৈতিক উন্নয়নে অবদান রাখছে।

(৩) মুদ্রাস্ফিতি রোধ (Reduction of Inflation): বীমা দু'ভাবে মুদ্রাস্ফিতি রোধে গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখছে। যথা: ১। প্রিমিয়ামের মাধ্যমে বাজার থেকে টাকা সংগ্রহ করে টাকার যোগান কমিয়ে দিচ্ছে। ২। উৎপাদনের জন্য পর্যাপ্ত তহবিল সরবারহ করে। যা মুদ্রাস্ফিতির গ্যাপ কমিয়ে আনতে সাহায্য করছে। কারণ, প্রিমিয়ামের মাধ্যমে প্রচুর টাকা সংগৃহীত হয় এবং তার বড় একটা অংশ আবার অধিক লাভে বিনিয়োগ করা হয়। মুদ্রাস্ফিতির মূল দুটি কারণ মূলত টাকার যোগান বৃদ্ধি পাওয়া এবং উৎপাদন কমে যাওয়া, যা বীমার মাধ্যমে যথাযথ নিয়ন্ত্রণ করা সম্ভব। তাই, বীমা যে কোন দেশের মুদ্রাস্ফিতি রোধে ব্যাপক অবদান রাখছে।

বীমার শ্রেণীবিভাগ (Classification of Insurance)

বীমাকে দুটি দৃষ্টিকোণ থেকে শ্রেণীবিভাগ করা যায়। যথা; ১। ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ থেকে ২। ঝুঁকির দিকে থেকে

১। ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোন থেকে বীমার শ্রেণী বিভাগ: ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোন থেকে বীমাকে প্রধানত: তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায়। যথা: i) জীবন বীমা ii) সাধারণ বীমা এবং iii) সামাজিক বীমা

i) জীবন বীমা (Life Insurance): জীবন বীমা মূলত মানুষের জীবনের উপর যে বীমা করা হয়, তাকে জীবন বীমা বলা হয়। বীমাগ্রহীতা নির্দিষ্ট প্রিমিয়ামের বিনিময়ে নিজের বা অন্যের জীবনের উপর বীমাপত্র গ্রহণ করতে পারে। তবে অন্যের জীবনের উপর বীমা গ্রহণের ক্ষেত্রে বীমাযোগ্য স্বার্থের প্রমাণ প্রয়োজন হয়। সমাজে জীবন বীমার প্রচলন সবচেয়ে বেশী। জীবন বীমার ফলে কোন বীমাগ্রহীতার অকাল মৃত্যু হলে, তাঁর পরিবারবর্গকে আর্থিক সুবিধা প্রদান করা হয়। আবার মেয়াদ কাল পর্যন্ত বেঁচে থাকলে বীমার অর্থ নিজেই ভোগ করতে পারে। জীবন বীমা অন্যান্য বীমা থেকে স্বত্যন্ত্র। কারণ অন্যান্য বীমা ক্ষতিপূরণের চুক্তি। কোন ঘটনা ঘটলেই শুধুমাত্র বীমার দাবী জন্মাবে, নতুবা নয়। কিন্তু জীবন বীমার ক্ষেত্রে নিশ্চয়তা প্রদান করা হয়। বীমা গ্রহীতার বীমা সময়ের মধ্যে মৃত্যু অথবা বীমার সময়কাল পর্যন্ড় বেচে থাকা উভয় অবস্থাতেই বীমার টাকা পাবার অধিকারী। বাংলাদেশে সরকারী, বেসরকারী, বৈদেশিক ও ইসলামী বীমা কোম্পানী কতৃক জীবন বীমা পরিচালিত হচ্ছে।

ii) সাধারণ বীমা (General Insurance): সাধারণ বীমার আওতায় সম্পদ বীমা, দায় বীমা ও অন্যান্য বীমা অন্তর্ভুক্ত। অগ্নি বীমা ও নৌ-বীমা সম্পত্তি বীমার অর্ন্তগত। মোটর, চুরি, মেশিন পত্র ইত্যদি দায় বীমার অন্ড়র্ভুক্ত।

ক. সম্পত্তি বীমা (Proparty Insurance): কোন ব্যক্তি বা ব্যক্তিগোষ্ঠির সম্পদের যখন কোন বীমা গ্রহণ করা হয় তাকে সম্পত্তি বীমা বলা হয়। নৌ, অগ্নি, চোর্য, দুর্ঘটনা ইত্যাদি সম্পত্তি বীমার আওতাভূক্ত।

অ. নৌ-বীমা (Marine Insurance): নৌ-বীমা সামদ্রিক বিপদ থেকে ক্ষতির নিরাপত্তা বিধান করে থাকে। সামদ্রিক বিপদগুলো যেমন কোন কিছুর সাথে ধাক্কা লাগা, জলদশ্যু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়া, আগুন, শত্রু কতৃক জাহাজ আক্রান্ত হওয়া ইত্যাদি। সামদ্রিক বিপদের ফলে জাহাজ, জাহাজের মালামাল, মানুষ, ভাড়া ইত্যাদি ক্ষতিগ্রস্থ হতে পারে। তাই নৌ-বীমা হয় জাহাজ, মালামাল ও ভাড়ার উপর। নৌ-বীমা গ্রহণের সময় বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকা বাধ্যতামূলক নয়। তবে, বীমার দাবী উত্থাপনের সময় অবশ্যই বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকতে হবে।

আ. অগ্নিবীমা (Fire Insurance): অগ্নি বীমা আগুনের ঝুঁকি থেকে নিরাপত্তা বিধান করে। অগ্নি বীমার অনুপস্থিতি শুধু ব্যক্তিকেই নয় সামাজকেও ক্ষতিগ্রস্থ করে। অগ্নি বীমার ক্ষেত্রে শুধু অগ্নিকান্ডের ফলে কোন সম্পদ ক্ষতি হলেই মাত্র ক্ষতিপূরণ পাওয়া যাবে, অন্যথায় নয়।

ই. বিবিধ বীমা (Miscellaneous Insurance): পণ্যসামগ্রী, আসবাবপত্র, কলকব্জা, যানবাহন, মোটরযান ইত্যদি সম্পদ-সম্পত্তি দুর্ঘটনার কবলে পড়ে ক্ষতিগ্রস্থ হলে বা চুরি হলে তার জন্য বীমাকারী ক্ষতিপূরণ দিবে। এধরনের সম্পদের জন্য আলাদা আলাদাভাবে বীমা পলিসি আছে। যেমনঃ মোটরযান বীমা, আসবাবপত্র বীমা, চোর্য বীমা, শষ্য বীমা, ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমা ইত্যাদি বিবিধ বীমার অন্ড়র্ভাত।

খ. দায় বীমা (Liability Insurance): একটি বীমা কোম্পানী যখন চুক্তি অনুসারে সম্পত্তির ধ্বংশ, ব্যক্তিগত দুর্ঘটনার ক্ষতি বা মৃত্যুজনিত ক্ষতিপূরণ করতে দায়বদ্ধ, তাকে দায় বীমা বলা হয়। এ দায় বীমাও সাধারণ বীমার আওতাভুক্ত। বিশ্বস্থতা বীমা (Fidelity Insurance) মোটরযান বীমা (Automobile Insurance) মেশিনারীজ বীমা (Machinary Insurance) ইত্যাদি দায় বীমার উদাহরণ।

গ. অন্যান্য ধরনের বীমা (Others Forms of Insurance): উপরে উল্লেখিত বীমা ব্যতিত আরও অনেক বীমা সাধারণ বীমার অন্ড়র্ভুক্ত যেমনঃ রপ্তানী বীমা, রাষ্ট্রীয় কর্মচারী বীমা, কর্মচারী বীমা, এ ধরনের বীমার উদাহরণ। এ ধরনের বীমার ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট কিছু ঘটনা ঘটলে নির্দিষ্ট পরিমাণ অর্থ পরিশোধ করা হয়। এধরনের বীমা এখন বেশ জনপ্রিয়তা ও ব্যাপকতা লাভ করেছে।

(iii) সামাজিক বীমা (Social Insurance): সমাজের অপেক্ষাকৃত আর্থিকভাবে দুর্বল জনগোষ্ঠি, যাদের প্রিমিয়াম প্রদানের পর্যাপ্ত অর্থ নেই; সে সকল লোকেদের স্বার্থ রক্ষার্থে সামাজিক বীমার জন্ম। অক্ষমতা ভাতা, বেকার ভাতা, পেনশন ব্যবস্থা, অসুস্থতা বীমা, শিল্প বীমা, প্রভৃতি সামাজিক বীমার উদাহরণ। আস্তে আস্তে সামাজিক বীমার প্রসার ও জনপ্রিয়তা বাড়ছে। এমনকি অনেক উন্নত দেশে এ ধরনের সামাজিক বীমা অপরিহার্য বলে গণ্য করা হচ্ছে।

2. ঝুঁকির দিক থেকে বীমার শ্রেণীবিভাগ
(Classification of Insurance From the View Point of Risk)

ঝুঁকির দিক থেকে বীমাকে নিম্নলিখিতভাবে শ্রেণীবিভাগ করা হয়েছে:

(১) ব্যক্তিগত বীমা (Personal Assurance): মানব জীবনের উপর যে বীমা গ্রহণ করা হয় যা মৃত্যু, দুর্ঘটনা বা রোগের কারণে ক্ষতির বিরুদ্ধে নিরাপত্তার বিধান করে থাকে। ব্যক্তিগত বীমার অধীনে জীবন বীমা, ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমা ও স্বাস্থ্য বীমা রয়েছে। জীবন বীমা সম্পর্কে পূর্বে কিছুটা আলোকপাত করা হয়েছে। তাই ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা সম্পর্কে আলোকপাত করা হলো। ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা হলো কোন দুর্ঘটনার ফলে যদি কোন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ক্ষতিগ্রস্থ বা জখম হয়, তার জন্য যে বীমা ব্যবস্থা। আবার স্বাস্থ্য বীমা বলতে কোন জটিল রোগের কারণে বা অসাধারণ অসুস্থতার চিকিৎসা ব্যয় প্রভৃতির জন্য যে বীমা ব্যবস্থার প্রচলন আছে, তাই স্বাস্থ্য বীমা নামে পরিচিত।

(২) সম্পত্তি বীমা (Property Insurance): কোন ব্যক্তির বা সমাজের সম্পত্তির সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে যে বীমা তাই সম্পত্তি বীমা। সম্পত্তি বীমার মধ্যে অগ্নি, নৌ, শিল্পে অপ্রত্যাশিত উৎপাদন হ্রাস পাওয়া, ব্যবসায়ের, কোন প্রধান ব্যক্তির অপ্রত্যাশিতভাবে মারা যাওয়া, মেশিন অকেজ হয়ে পড়া, সম্পদের চুরি ইত্যাদি সম্পত্তি বীমার অর্ন্তগত।

(৩) দায় বীমা (Liability Insurance): দায় বীমা ৩য় পক্ষ বীমা, কর্মচারী বীমা, মোটর বীমা, ও পূন:বীমা দায় বীমার আওতাভূক্ত করা হয়েছে। ঝুঁকির দিক থেকে এ বীমাগুলো একই প্রকৃতির বলে একই শ্রেণীভূক্ত করা হয়েছে।

(৪) গ্যারান্টি বীমা (Gauruntee Insurance): এ বীমা আস্থা বীমা, ধার বীমা, সুবিধা বীমা প্রভৃতি এ বীমায় স্থান পেয়েছে। ঝুঁকির দিকে থেকে এগুলো সমজাতীয়। যেমন, রপ্তানী বীমায় আমদানীকারক কতৃক মূল্য পরিশোধিত না হলে বীমাকারী পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দান করে।

বীমার শ্রেণী বিভাগের আরও ব্যাপকতা প্রয়োজন। পূর্বে উল্লেখিত বীমার শ্রেণী বিভাগারে বাইরে আরও নানা প্রকার বীমা ব্যবস্থার প্রচলন আছে। যেমন যুগ্ন বীমা, পূন;বীমা, গোষ্ঠী বীমা, ইত্যাদি। এখানে সংক্ষিপ্ত আকারে বীমার শ্রেণীবিভাগ করা হলো। পরবর্তীতে আরও ব্যাপক আলোচনা করা হবে।

পাঠ সংক্ষেপ: ৭.২

বীমার প্রধান ও প্রথম কাজ হলো সম্ভাব্য অনিশ্চিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করা। বীমা গ্রহণকারী প্রত্যেক ব্যক্তি বীমাপত্র গ্রহণের জন্য একটি নির্দিষ্ট হারে প্রিমিয়াম প্রদান করে। বীমা কোম্পানীগুলো দীর্ঘ মেয়াদী মূলধনের সবচেয়ে প্রধান উৎস। বীমা মানুষের বিভিন্ন ধরনের নিরাপত্তা প্রদান করে থাকে। জীবন বীমা সঞ্চয়ে মানুষকে উৎসাহিত করে থাকে। জীবনবীমা একজন ব্যক্তির নানাবিধ অভাব পূরণ করে। বিশেষ করে জীবন বীমা পরিবারের আর্থিক অভাব পূরণে ভূমিকা পালন করে। কোন ব্যক্তির বা সমাজের সম্পত্তির সম্ভাব্য ক্ষতির বিরুদ্ধে যে বীমা তাই সম্পত্তি বীমা। দায় বীমা ৩য় পক্ষ বীমা, কর্মচারী বীমা, মোটর বীমা, ও পূন:বীমা দায় বীমার আওতাভূক্ত করা হয়েছে। রপ্তানী বীমায় আমদানীকারক কতৃক মূল্য পরিশোধিত না হলে বীমাকারী পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দান করে।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৭.২

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন ($\surd$) দিন

১. বীমার প্রধান ও প্রধান কাজ হল ____ ।
   ক) অনিশ্চিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করা
   খ) নিশ্চিত ক্ষতি থেকে রক্ষা করা
   গ) ব্যবসায়িক ক্ষতি থেকে রক্ষা করা
   ঘ) কোনটি নয়

২. বীমা কোম্পানী কোন মেয়াদি মূলধনের উৎস?
   ক) স্বল্প
   খ) মধ্যম
   গ) দীর্ঘ
   ঘ) কোনটি নয়

৩. কোন ব্যক্তির বা সমাজের সম্পত্তির স্বম্ভাব্য ক্ষতির বিপরীতে যে বীমা করা হয় তাকে কী বীমা বলে?
ক) গোষ্ঠিবীমা খ) সম্পত্তিবীমা
গ) জীবন বীমা ঘ) দুর্ঘটনা বীমা

৪. রপ্তানী বীমায় আমদানীকারক কর্তৃক মূল্য পরিশোধিত না হলে বীমাকারী পরিশোধ করার প্রতিশ্রুতি দান করে। এ বীমাকে কী বীমা বলে?
ক) দায় বীমা খ) ব্যক্তিগত বীমা
গ) সম্পত্তি বীমা ঘ) গ্যারান্টি বীমা

৫. কোনটি দায় বীমার অন্তর্ভুক্ত নয়?
ক) মোটর বীমা খ) কর্মচারী বীমা
গ) পুনঃবীমা ঘ) জীবন বীমা

পাঠ- ৩ পূন:বীমা, যুগ্মবীমা ও বাজী চুক্তি
Reinsurance, Double Insurance and Wagery Contract

উদ্দেশ

এ পাঠ শেষে আপনি–

- ☞ পূন:বীমা ও যুগ্ম বীমার সংজ্ঞা বলতে পারবেন।
- ☞ পূন:বীমা ও যুগ্ম বীমার মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন।
- ☞ বাজীধরা চুক্তি বর্ণনা করতে পারবেন।
- ☞ বীমা ও বাজী চুক্তির মধ্যে পার্থক্য করতে পারবেন।
- ☞ যৌথ বীমা সম্পর্কে বলতে পারবেন এবং
- ☞ গোষ্ঠীবীমা সম্পর্কে ধারনা লাভ করবেন।

বিষয়বস্তু

পূনবীমা (Reinsurance): যখন একজন বীমাকারী তার বীমাকৃত বিষয়বস্তু অন্য বীমাকারীর নিকট বীমা করে তখন তাকে পূনবীমা বলা হয়। এক্ষেত্রে প্রথম বীমাকারী বীমা গ্রহীতা এবং ২য় বীমাকারী পূনবীমাকারী বলে গণ্য হবে। যেমন ধরুন সাধারণত; যখন একজন বীমাকারী কোন বিষয়বস্তুর বীমা গ্রহণ করার পর যদি মনে করে তাঁর পক্ষে সব ঝুঁকি এককভাবে বহন করা সম্ভব নয়; সেক্ষেত্রে, নিজে বীমা গ্রহীতা হয়ে তাঁর বীমাকৃত বিষয়বস্তু ঝুঁকি হ্রাসের জন্য অন্য একটি বীমা কোম্পানীর নিকট বীমা করে। উদাহরণস্বরূপ মনে করুন ক একটি বীমাকারী তার বীমাকৃত বিষয়বস্তু তার একার পক্ষে ঝুঁকি বহন করা সম্ভব নয় বলে মনে করে খ নামক অন্য একটি বীমা প্রতিষ্ঠানের নিকট বীমা করল। এটাকে পূন:বীমা বলা হবে। "ক" কোম্পানী এখানে বীম গ্রহীতা এবং "খ" কোম্পানী এখানে পূনবীমাকারী।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, মূল বীমা গ্রহীতার সাথে পূনবীমাকারীর কোন সম্পর্ক নেই। মূল বীমা গ্রহীতা ও আদি বীমাকারীর মধ্যে যে চুক্তি হবে সে চুক্তির শর্তাবলী দ্বারা পূনবীমা নিয়ন্ত্রিত হবে। কোন কারণে প্রথম চুক্তি বাতিল হলে পূনবীমা চুক্তিও বাতিল বলে গণ্য হবে।

যুগ্ম বা দ্বৈতবীমা (Double Insurance): যদি কোন বীমা গ্রহীতা একই বিষয়বস্তুর উপর দুটি বীমা কোম্পানীর সাথে পৃথক পৃথক বীমা চুক্তি করেন, তাহলে তাকে যুগ্ম বা দ্বৈত বীমা বলা হয়। ধরুন, জনাব আ: রহিম তাঁর একটি বাড়ী 'ক' কোম্পানীর সাথে ৫,০০,০০০ টাকায় বীমা করল। তারপর উক্ত বাড়ীটি খ কোম্পানীর সাথে ৪,০০,০০০ টাকায় পূনরায় একটি বীমা চুক্তি করল। এটি একটি যুগ্ম বীমার উদাহরণ। মনে করুন বাড়িটি আগুনে আংশিক পুড়ে গেল এবং তাতে ২,০০,০০০ টাকার ক্ষতি হলো। জনাব আ: রহিম উভয় কোম্পানীর নিকট থেকে মোট (১,০০,০০০+১,০০,০০০)=২,০০,০০০ ক্ষতিপূরণ আদায় করতে পারবেন। তিনি ক্ষতির বেশী টাকা দাবী করতে পারবেন না । কারণ বীমা একটি ক্ষতি পূরণের চুক্তি। কাউকে বীমা থেকে লাভ করতে দেওয়া হয়না। শুধু ক্ষতিপূরণ করা হয়। কিন্তু জীবন বীমার ক্ষেত্রে এর ব্যতিক্রম। মানুষের জীবন যেহেতু টাকার দ্বারা পরিমাপ করা যায় না, তাই যত টাকার বীমা করা হয় তত টাকাই তিনি পাবেন। যেমন ধরুন জনাব জাহিদ দুটি বীমা কোম্পানীর সাথে তার জীবনের উপর পৃথক দুটি (ক কোম্পানীর সাথে ২,০০,০০০ টাকা খ কোম্পানীর সাথে ৩,০০,০০০ টাকা) ৫,০০,০০০ টাকার বীমা পত্র গ্রহণ করলেন। যদি তিনি বীমা সময় চলাকালে মারা যান তবে তিনি (২,০০,০০০+৩,০০,০০০)=৫,০০,০০০ টাকা দুটি কোম্পানী থেকে পাবেন।

সাধারণত: জীবন বীমার ক্ষেত্রে যুগ্মবীমা অধিক প্রচলিত ও লাভ জনক। কিন্তু নৌ, অগ্নি প্রভৃতি যেহেতু ক্ষতি পূরণের চুক্তি, তাই প্রকৃত ক্ষতির বেশী ক্ষতিপূরণ পাবে না বিধায় এক্ষেত্রে যুগ্ম বীমা লাভজনক নয়।

পূন:বীমা ও যুগ্মবীমার মধ্যে পার্থক¨ (Difference Between Double Insurance and Re-insurance)

পূন:বীমা ও যুগ্মবীমার মধ্যে কিছু কিছু পার্থক্য বিরাজমান যা নিম্নে দেখানো হলো

১. পূন:বীমা হলো দুটি বীমা কোম্পানীর সাথে চুক্তি, পক্ষান্তরে, যুগ্ম বীমা হলো একই বিষয়বস্তুর উপর দুটি কোম্পানীর সাথে পৃথক দুটি চুক্তি।

২. পূন:বীমার ক্ষেত্রে মূল বীমা গ্রহীতার কোন লাভ বা দায়দায়িত্ব থাকে না। কিন্তু যুগ্নবীমার ক্ষেত্রে বীমা গ্রহীতার দায় দায়িত্ব ও সুবিধা বৃদ্ধি পায়।
৩. ঝুঁকির পরিমাণ কমানোর জন্য পূনবীমা করা হয়; অপর দিকে বীমাযোগ্য স্বার্থ রক্ষার জন্য যুগ্নবীমা করা হয়।
৪. পূন:বীমা পূর্বের কোন বীমা চুক্তিকে বাদ দিয়ে করা যায় না; পক্ষান্তরে যুগ্নবীমা পূর্বের বীমা চুক্তিকে সম্পূর্ণ বাদ দিয়েও করা যায়।
৫. পূন:বীমার ক্ষেত্রে প্রথম বীমা চুক্তি বাতিল হলে পূন:বীমাও বাতিল হয়ে যায়, কিন্তু যুগ্নবীমার ক্ষেত্রে তা প্রযোজ্য হবে না অর্থাৎ বাতিল হবে না।
৬. পূন:বীমার ক্ষেত্রে প্রথম বীমাকারী পরবর্তী বীমার জন্য দায়ী থাকে। কিন্তু যুগ্নবীমার ক্ষেত্রে প্রথম বীমাকারী পরবর্তী বীমাকারীর নিকট দায়ী থাকে না।
৭. পূন:বীমা অগ্নিবীমার ক্ষেত্রে বেশী প্রয়োগ হয়। অন্য দিকে, যুগ্নবীমা জীবন বীমার ক্ষেত্রে বেশী ব্যবহৃত হয়।
৮. পূন:বীমা ক্ষতিপূরণের নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু, যুগ্নবীমা ক্ষতিপূরণের নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত নয়।

যৌথ বীমা (Joint Insurance): যৌথবীমা একই বীমা পত্র একাধিক জীবনের উপর যে বীমাপত্র গ্রহণ করা হয়। যেমন ধরুন, জনাব আকবর ও তার স্ত্রী ক কোম্পানীর সাথে যৌথভাবে একটি বীমাপত্র করলেন। এটা যৌথ বীমাপত্রের একটি উদাহরন। যৌথবীমা পত্র বিভিন্ন প্রকার হতে পারে। যেমন যৌথ জীবন বীমাপত্র, শেষ উত্তরজীবি বীমাপত্র, উত্তরজীবি বীমা পত্র। যে সকল জীবনের উপর করা হয় তাদের মধ্যে সর্বশেষ ব্যক্তির মৃত্যুর আগ পর্যন্ত বীমা পত্রের টাকা পাওয়া যায় না। প্রিমিয়াম তুলনামূলক কম। যৌথ জীবন বীমা প্রথানত: তিন প্রকার যথা: যৌথ আজীবন বীমা, যৌথ মেয়াদী বীমা ও যৌথ সাময়িক বীমা। যৌথ বীমা সাধারণত স্বামী-স্ত্রী, অংশীদারগণ ও পারিবারিক সম্পর্ক যুক্ত একাধিক ব্যক্তির সাথে একই সাাথে গ্রহণ করা যায়। এ জাতীয় বীমা শুধুমাত্র জীবন বীমার ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য। মোট কথা হলো, একাধিক ব্যক্তি একত্রে যৌথভাবে যখন তাদের জীবনের উপর কোন বীমা পত্র গ্রহণ করে, তখন তাকে যৌথ বীমা বলা হয়।

গোষ্ঠী বীমা (Group Insurance): গোষ্ঠী বীমাও একাধিক জীবনের উপর করা হয়। সেদিক থেকে এটাও বহু জীবন বীমার আওতাভুক্ত। তবে, এটার প্রকৃতি একটু ভিন্নতর বিধায় এটাকে আলাদাভাবে দেখানো হয়েছে। এ বীমার অধীনে স্বল্প প্রিমিয়ামে কোন প্রতিষ্ঠানের সকল কর্মচারীর জন্য একটি বীমা পত্র গ্রহণ করা হলে তাকে গোষ্ঠী বীমা বলা হয়ে থাকে। বর্তমানে বাংলাদেশে সরকারী, আধাসরকারী ও স্বায়ত্বশাসিত প্রতিষ্ঠানে গোষ্ঠী বীমা প্রায় অপরিহার্য করা হয়েছে। এক্ষেত্রে একটি প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের জন্য একটি বীমা পত্র দেয়া হয়। সদস্য সংখ্যা বেশী হলে ডাক্তারী পরীক্ষা ছাড়া গড় বয়সের উপর বীমা প্রিমিয়াম নির্ধারণ করা হয়। সাধারণত: প্রিমিয়াম ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠান সম্মিলিতভাবে প্রদান করে থাকে। কেউ চাকুরীকালীন নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে মারা গেলেই মাত্র নির্ধারিত পরিমাণ আর্থিক সুবিধা দেওয়া হয়।

বীমা চুক্তি ও বাজী চুক্তির মধ্যে তুলনা (A Comparison Between Insurance Contract and Wagery Contract)

বীমা চুক্তি ও বাজী চুক্তি আপাত দৃষ্টিতে এক মনে হলেও এদের মধ্যে বহুবিধ পার্থক্য বিদ্যমান, যা নিম্নে বর্ণনা করা হলো:

১. বীমাযোগ্য স্বার্থ: বীমা চুক্তির ক্ষেত্রে বীমা যোগ্যস্বার্থ আবশ্যক; কিন্তু, বাজী ধরার চুক্তিতে বীমাযোগ্য স্বার্থের প্রয়োজন হয় না।
২. বৈধতা: বীমা চুক্তি আইনত বৈধ; কিন্তু, বাজী ধরার চুক্তি আইনত অবৈধ।
৩. ক্ষতিপূরণ: জীবন বীমা ব্যতিত অন্যান্য বীমা চুক্তি ক্ষতিপূরণের নীতির উপর প্রতিষ্ঠিত। পক্ষান্তরে, বাজী ধরার চুক্তি ক্ষতিপূরণের কোন বালাই নেই।
৪. সরল বিশ্বাস: বীমা চুক্তি সরল বিশ্বাসের চুক্তি। এ ক্ষেত্রে উভয় পক্ষকে মন খুলে প্রয়োজনীয় সকল তথ্য প্রকাশ করা বাধ্যতা মূলক। কিন্তু বাজী ধরার চুক্তিতে সরল বিশ্বাসের কোন শর্ত নেই।
৫. প্রিমিয়াম: বীমার ক্ষেত্রে বীমা গ্রহীতাকে প্রিমিয়াম প্রদান করতে হয়; তা প্রতিদান হিসেবে গণ্য । কিন্তু, বাজী ধরার চুক্তিতে এমন কোন বিষয় নেই।
৬. ঝুঁকি হস্তান্তর : বীমার ক্ষেত্রে বীমাগ্রহীতা ভবিষ্যতের কোন ঝুঁকিকে বীমাকারীর নিকট হস্তান্তর করে। বাজী ধরার চুক্তিতে ঝুঁকি হস্তান্তরের বিষয় অনুপস্থিত।

৭. বৈজ্ঞানিক হিসাব: বীমার ক্ষেত্রে ঝুঁকি নির্ণয় ও প্রিমিয়াম নির্ধারণের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়। কিন্তু, বাজী চুক্তির ক্ষেত্রে বৈজ্ঞানিক হিসাবের কোন স্থান নেই।
৮. আনুষ্ঠানিকতা: বীমা চুক্তির ক্ষেত্রে কিছু আনুষ্ঠানিকতা পালন করতে হয়, যা বাজী চুক্তির ক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই।
৯. মেয়াদ: বীমা চুক্তি সাধারণত: একটি সময়সীমার জন্য হয়ে থাকে। কিন্তু, বাজী চুক্তি তাৎক্ষণিকভাবে হয়ে থাকে।
১০. জনস্বার্থ: বীমা চুক্তি জনস্বার্থ রক্ষা করে। বাজী চুক্তি জনস্বার্থ বিরোধী।

পরিশেষে বলা যায়, বীমা একটি বৈধ চুক্তি, আর বাজীধরা একটি মূলত অবৈধ চুক্তি। যা কোন চুক্তিই নয়।

পাঠ সংক্ষেপ: ৭.৩

যখন একজন বীমাকারী তার বীমাকৃত বিষয়বস্তু অন্য বীমাকারীর নিকট বীমা করে তখন তাকে পূনবীমা বলা হয়। এক্ষেত্রে প্রথম বীমাকারী বীমা গ্রহীতা এবং ২য় বীমাকারী পূনবীমাকারী বলে গণ্য হবে। যদি কোন বীমা গ্রহীতা একই বিষয়বস্তুর উপর দুটি বীমা কোম্পানীর সাথে পৃথক পৃথক বীমা চুক্তি করেন, তাহলে তাকে যুগ্ন বা দ্বৈত বীমা বলা হয়। পূন:বীমা হলো দুটি বীমা কোম্পানীর সাথে চুক্তি, পক্ষান্তরে, যুগ্ন বীমা হলো একই বিষয়বস্তুর উপর দুটি কোম্পানীর সাথে পৃথক দুটি চুক্তি। পূন:বীমা ক্ষতিপূরণের নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত; কিন্তু, যুগ্নবীমা ক্ষতিপূরণের নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত নয়। যৌথবীমা একই বীমা পত্র একাধিক জীবনের উপর যে বীমাপত্র গ্রহণ করা হয়। গোষ্ঠী বীমাও একাধিক জীবনের উপর করা হয়। বীমাযোগ্য স্বার্থ: বীমা চুক্তির ক্ষেত্রে বীমা যোগ্যস্বার্থ আবশ্যক; কিন্তু, বাজী ধরার চুক্তিতে বীমাযোগ্য স্বার্থের প্রয়োজন হয় না।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৭.৩

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১. বীমার উপর বীমা করা হলে তাকে কী বলে?
ক) পুনঃবীমা খ) যুগ্নবীমা
গ) যৌথবীমা ঘ) কোনটি নয়

২. একটি বিষয়বস্তুর উপর দু'টি পৃথক পৃথক কোম্পানির সাথে বীমা করা হলে তাকে কী বলে?
ক) পুনঃবীমা খ) যুগ্নবীমা
গ) যৌথবীমা ঘ) কোনটি নয়

৩. যুগ্নবীমায় চুক্তির পরিমাণ কয়টি?
ক) ১ টি খ) ২ টি
গ) ৩ টি ঘ) ৪ টি

৪. কোনিট ক্ষতিপূরণের নীতির উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত নয়?
ক) জীবনবীমা খ) পুনঃবীমা
গ) যুগ্নবীমা ঘ) যৌথবীমা

৫. বাজী ধরার চুক্তিতে কোনটি নেই?
ক) বীমাযোগ্য স্বার্থ খ) সম্মিলিত স্বার্থ
গ) আর্থিক স্বার্থ ঘ) কোনটি নয়

পাঠ- ৪ বীমা চুক্তির অপরিহার্য উপাদানসমূহ
Essential Elements of Insurance Contract

D‡Ïk¨

এ পঠ শেষে আপনি–

- ☞ চুক্তির সাধারণ উপাদানসমূহ বর্ণনা করতে পারবেন; এবং
- ☞ বীমা চুক্তির বিশেষ উপাদানসমূহ বলতে পারবেন।

বিষয়বস্তু

সাধারণ চুক্তির উপাদানসমূহ (Elements of General Contract)

নিম্নে সাধারণ চুক্তির উপাদানসমূহ সংক্ষেপে বর্ণনা করা হলো:

১. একাধিক পক্ষ (More than one Party): কোন চুক্তি সম্পাদন করার জন্য কমপক্ষে দুটি পক্ষ থাকতে হবে। এক পক্ষ দ্বারা আর যাই হউক চুক্তি করা যায় না। ধরুন, জাহিদ একটা দ্রব্য বিক্রি করতে চায়। এক্ষেত্রে বিক্রির জন্য চুক্তি হতে হলে অন্য আর একজন ক্রেতা হিসেবে থাকতে হবে। তাহলেই এ দু'পক্ষের মধ্যে বিক্রয় চুক্তি হতে পারে।

২. প্রস্তাব (Offer): ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের ২(ক) ধারা মতে যখন কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির কাছে কিছু করা বা করা থেকে বিরত থাকার জন্য তার সায় পাবার অথবা নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন, তকে প্রস্তাব বলা হয়। যেমন; বদর তার ঘোড়াটি কবিরের নিকট ৫,০০০ টাকায় বিক্রিয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করল। এটি একটি প্রস্তাব।

৩. স্বীকৃতি (Acceptance): চুক্তি আইনের ২(খ) ধারা মতে-যার কাছে প্রস্তাব প্রদত্ত হয়েছে সে প্রস্তাবটি কোন পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন বা বিয়োজন ছাড়াই গ্রহণ করলে অথবা প্রস্তাবের প্রতি হুবহু সায় প্রদান করলে তাকে স্বীকৃতি বলে। উপরের উদাহরণে কবির যদি কোনরূপ শর্ত আরোপ না করে বদরের প্রস্ড়াবে ৫,০০০ টাকায় ঘোড়াটি ক্রয় করতে রাজী হয় তবে এটাকে স্বীকৃতি বলা হবে। কিন্তু কবির যদি ঘোড়াটি ৪,৫০০ টাকায় ক্রয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করে, তবে এটা পাল্টা প্রস্তাব হবে।

৪. সম্মতি (Agreement): চুক্তি আইনের ২(ঙ) ধারাতে বলা হয়েছে যে, পরস্পরের মধ্যে প্রতিদান গঠনকারী প্রতিটি প্রতিশ্রুতি বা প্রতিশ্রুতিসমূহের সমষ্টিকে সম্মতি বলে। সম্মতি যেকোন বৈধ চুক্তির জন্য অপরিহার্য উপাদান। উপরের উদাহরণে বদরের প্রস্তাবে কবির যদি ঘোড়াটি ৫,০০০ টাকায় ক্রয়ের জন্য রাজী হয় তাহলে এটাকে একটি সম্মতি বলা যাবে।

৫. দায় দায়িত্ব (Obligation): উভয় পক্ষের মধ্যে কোন বিষয়ে সম্মতি প্রদান করলে তাদের মধ্যে কিছু দায় দায়িত্ব সৃষ্টি হয়। যেমন ধরুন বদর যদি কবিরকে ঘোড়াটি সম্মতির ভিত্তিতে দিয়ে দেয়, সেক্ষেত্রে কবিরের দায়িত্ব হলো বদরকে ৫,০০০ টাকা প্রদান করা। অবার কবির যদি প্রথম বদরকে ৫,০০০ টাকা প্রদান করে, সেক্ষেত্রে বদরের দায়িত্ব হলো কবিরকে ঘোড়াটি দিয়ে দেয়া। এক্ষেত্রে কোন পক্ষ ইচ্ছাকৃতভাবে তার দায়িত্ব পালনে অস্বীকৃতি জানালে চুক্তি ভঙ্গের জন্য দায়ী হবে।

৬. নিশ্চয়তা (Certainty): চুক্তি গঠনের ক্ষেত্রে সম্মতির বিষয় বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে নিশ্চয়তা থাকতে হবে। অর্থাৎ প্রস্তাব ও স্বীকৃতি সুস্পট ও সুনির্দিষ্ট হতে হবে, নতুবা চুক্তি গঠিত হবে না। ধরুন, ক একজন কৃষক, খ কে তার বাগানের ৫০০ মন আম বিক্রয়ের ইচ্ছা প্রকাশ করল। খ তাতে সায় প্রদান করল। এটা চুক্তি হবে না। এটা একটি মত বিনিময় মাত্র। কারণ এখানে কোন অঙ্গীকার নেই, দামের বিষয়ে উল্লেখ নেই ইত্যাদি।

৭. চুক্তি পালনের সম্ভাব্যতা ও যৌক্তিকতা (Posibility and Rationality of Performance): কোন অযৌক্তিক বা অবাস্তব বিষয়ে প্রস্তাব ও স্বীকৃতির মাধ্যমে সম্মত হলে তা চুক্তি হবে না। যেমন, দবির প্রস্তাব করল যে, সে ছবিরের মৃত বাবাকে জীবন্ত করতে পারলে তাকে ১,০০,০০০ টাকা প্রদান করবে। এ বিষয়ে উভয় পক্ষ নিঃশর্তভাবে সম্মত হলো। কিন্তু, এক্ষেত্রে কোন চুক্তি হবে না । কারণ, কোন মৃত ব্যক্তিকে কোন মানুষের পক্ষে জীবিত করা সম্ভব নয়।

৮. প্রতিদান (Consideration): চুক্তি আইনের ২(ঘ) ধারা মতে প্রতিশ্রতি দাতার ইচ্ছা অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি গ্রহীতা বা অন্য কোন ব্যক্তি যখন কোন কার্য করে থাকেন বা করা থেকে বিরত থাকেন অথবা কোন কার্য করা বা করা থেকে নিবৃত্ত থাকার প্রতিশ্রুতি প্রদান করে, তখন এরূপ কার্য বা নিবৃত্ত অথবা প্রতিশ্রুতিকে বলা হয় উক্ত প্রতিশ্রুতির প্রতিদান। প্রতিদান ছাড়া কোন চুক্তি হয় না। ধরুন আপনি বাজারে গিয়ে ৫০ টাকার বিনিময়ে এক কেজি আম ক্রয় করলেন। এক্ষেত্রে বিক্রেতার প্রদত্ত আম এবং আপনার কতৃক প্রদত্ত ৫০ টাকা প্রতিদান। তবে, এ আইনের কিছু ব্যতিক্রম আছে।

৯. পক্ষসমূহের যোগ্যতা (Eligibility of the Parties Concerned): চুক্তি আইনের ১১ ধারা অনুযায়ী আইনত প্রাপ্ত বয়স্ক, প্রকৃতস্থ, আর্থিকভাবে স্বচ্ছল এমন প্রত্যেক ব্যক্তিই চুক্তি সম্পাদনের যোগ্য। এ ধারা অনুসারে অপ্রাপ্তবয়স্ক, বিকৃত মস্তিস্ক, দেউলিয়া ব্যক্তি এবং দেশীয় আইনে অযোগ্য ব্যক্তি চুক্তি সম্পাদন করতে অযোগ্য। তাই, চুক্তি সম্পাদনের জন্য চুক্তি করার যোগ্যতা একটি অপরিহার্য উপাদান।

১০. আইনগত আনুষ্ঠানিকতা (Legal Formalities): কোন চুক্তি গঠনের জন্য আইনগত কোন আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হলে তা পালন না করলে চুক্তি বৈধ হবে না। যেমন; বীমা চুক্তি লিখিত না হলে এবং জমি বিক্রয় চুক্তি লিখিত ও নিবন্ধিত না হলে তা কার্যকর করা যায় না। তাই, প্রয়োজনীয় আইনগত আনুষ্ঠানিকতা পালনও চুক্তির অন্যতম উপাদান।

১১. স্বেচ্ছা সায় (Free Consent): চুক্তি গঠনের জন্য উভয় পক্ষের স্বেচ্ছা সায় একান্ত অপরিহার্য। কোন পক্ষ অপর পক্ষের নিকট থেকে জোরপূর্বক প্রতারনা বা মিথ্যা বর্ণনার মাধ্যমে সায় আদায় করলে তা বৈধ হবে না। যেমন ধরুন, কবির রজবের নিকট থেকে তার বাড়ীটি জোরপূর্বক কিনে নিল। এ ক্ষেত্রে রজবের যেহেতু সেচ্ছা সায় ছিলনা বাড়িটি বিক্রয়ের ক্ষেত্রে, তাই এটা বাতিলযোগ্য চুক্তি।

১২. উদ্দেশ্য ও প্রতিদানের বৈধতা (Legality of Object and Consideration): কোন চুক্তি হতে হলে পক্ষসমূহের উদ্দেশ্য ও প্রতিদান বৈধ হতে হবে, নতুবা চুক্তি বৈধ হবে না। যেমন ধরুন, কবির একটি ঘোড়া বিক্রি করে যা তার চোরাই ঘোড়া ছিল। এটি অবৈধ চুক্তি। আবার ধরুন, মিলটন জহিরকে হত্যার উদ্দেশ্যে ১,০০,০০ টাকা প্রদান করার প্রতিশ্রুতি দিল এবং শহীদ তাতে সায় প্রদান করল। এটাও অবৈধ চুক্তি। সুতরাং পক্ষসমূহের উদ্দেশ্য ও প্রতিদান বৈধ না হলে চুক্তি বৈধ হবে না।

বিশেষ উপাদভনসমূহ (Special Elements)

বীমা চুক্তি হতে হলে সাধারণ চুক্তিগুলোর পাশাপাশি বীমার বিশেষ কিছু উপাদানও পালন করতে হবে। বীমার বিশেষ উপাদানগুলো নিম্নে বর্ণিত হলো:

১.বীমাযোগ্য স্বার্থ (Insurable Interest): বীমা গ্রহণ করতে হলে বীমা গ্রহীতার বিষয়বস্তুর উপর বীমাযোগ্যস্বার্থ থাকতে হবে। বীমা যোগ্যস্বার্থ হলো, যদি বিষয়বস্তুটি টিকে থাকে, তবে বীমা গ্রহীতা আর্থিকভাবে লাভবান হবে, আর বিনষ্ট হলে সে অর্থনৈতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। আর এ সম্পর্ক হতে হবে বৈধ। এধরনের স্বার্থ না থাকলে কোন ব্যক্তি কোন বিষয়ের উপর বীমা গ্রহণ করতে পারে না। তাই বীমাযোগ্য স্বার্থ বীমা চুক্তির একটি অপরিহার্য উপাদান।

২. চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস (Utmost Good Faith): বীমা চুক্তি হলো চূড়ান্ত বিশ্বাসের চুক্তি। পারস্পরিক বিশ্বাসই বীমা চুক্তির ভিত্তি। তাই বীমাকারী ও বীমা গ্রহীতা সরল বিশ্বাসে উভয়ে সকল তথ্য পরস্পরের নিকট উপাস্থাপন করবে। প্রয়োজনীয় কোন তথ্য গোপণ করবে না। যেমন, যে বিষয় ঝুঁকি বৃদ্ধিকরে তা গোপণ করা বেআইনী। তাই প্রয়োজনীয় সকল তথ্য সঠিক ও নির্ভুল হতে হবে। জেনেশুনে কোন তথ্য গোপণ করলে পরবর্তীতে চুক্তি বাতিল হতে পারে। তাই চূড়ান্ত বিশ্বাস বীমা চুক্তির অন্যতম একটি উপাদান।

৩. ক্ষতিপূরণ (Indemnity): ক্ষতিপূরণ করা বীমা চুক্তির একটি উপাদান। বীমার মাধ্যমে কাউকে লাভ করতে দেয়া হবে না। ক্ষতিপূরণে আনীত বীমা চুক্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সহায়তা করে। তবে, এটি জীবন বীমা বাদে অন্যান্য বীমা চুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

৪. স্থলাভিষিক্ততা (Subrogation): কোন দুর্ঘটনা ঘটলে বীমাকারী যদি বীমাগ্রহীতাকে চুক্তি অনুযায়ী পুরো ক্ষতিপূরণ করে দেয়, তাহলে এর পর যা কিছু থাকে তার মালিক বীমাগ্রহীতার পরীবর্তে বীমাকারী হবে। এটাও জীবন বীমা বাদে অন্যান্য চুক্তির ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রযোজ্য। মনে করুন, ক একটি গাড়ী খ নামক বীমা কোম্পানীর নিকট ৫,০০,০০০ টাকার বীমা করে। এটি সড়ক দুর্ঘটনায় ধ্বংশ প্রাপ্ত হয়। চুক্তি মোতাবেক বীমা কোম্পানী উক্ত বীমা গ্রহীতাকে ৫,০০,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ দিয়েছিল। তারপর ধ্বংশ প্রাপ্ত গাড়ী বিক্রি করে ২০,০০০ টাকা পাওয়া গেল, যার মালিক বীমা কোম্পানী হবে, বীমা গ্রহীতা হবে না।

৫. শর্তাবলী (Warranties): বীমার কতগুলো শর্ত আছে, যা উভয় পক্ষকেই বিশেষত; বীমা গ্রহীতাকে পালন করতে হয়; তা না হলে, বীমাকারী তার দায় থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারেন। এগুলো বীমার ক্ষেত্রে শর্তাবলী হিসেবে গণ্য করা হয়। এ শর্তগুলো আবার বিভিন্ন রকম হতে পারে। যথা: প্রকাশ্য শর্ত, অপ্রকাশ্য শর্ত, কার্যকর শর্ত, প্রতিশ্রুতিমূলক শর্ত ইত্যাদি। এ শর্তগুলো বীমার ক্ষেত্রে অপরিহার্য উপাদান বলে গণ্য করা হয়।

৬. মনোনয়ন ও অধিকার অর্পণ (Nomination and Assignment): মনোনয়ন হলো কোন বীমাগ্রহীতার অর্বতমানে কে বীমার অধিকার ভোগ করবে তাঁর বা তাঁদের নাম বীমাপত্র গ্রহণ করার সময় উলে- খ করতে হয়। এ মনোনয়ন বিশেষত: জীবন বীমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হয়। কোন জীবন বীমাগ্রহীতা মৃত্যুবরণ করার পর বীমাকারী কাকে টাকা দিবে তা নির্দিষ্ট না থাকলে জটিলতা দেখা দিবে। পক্ষান্ড্রের অধিকার অর্পণ হলো, বীমা গ্রহীতা যদি বীমা পত্রের অধিকার অন্য কাউকে হস্ড়ান্ড্র করেন, তাকে অধিকার অর্পণ করা বলা হয়। জীবন বীমার ক্ষেত্রে প্রধানত: অধিকার অর্পণ ব্যবহৃত হয়। তবে, নৌ-বীমার ক্ষেত্রেও অধিকার অর্পণের প্রচলন রয়েছে। তাই মনোনয়ন ও অধিকার অর্পণ বীমার আর একটি উপাদান।

৭. কিস্তি ফেরত (Return of Premium): সাধারণত: বীমা কিস্তির টাকা ফেরত দেওয়া হয় না। তবে বিশেষ ক্ষেত্রে বীমা কিস্তি শর্তসাপেক্ষে ফেরত দেয়া হয়।

পাঠ সংক্ষেপ: ৭.৪

কোন চুক্তি সম্পাদন করার জন্য কমপক্ষে দুটি পক্ষ থাকতে হবে। ১৮৭২ সালের চুক্তি আইনের ২(ক) ধারা মতে যখন কোন ব্যক্তি অন্য কোন ব্যক্তির কাছে কিছু করা বা করা থেকে বিরত থাকার জন্য তার সায় পাবার অথবা নিজের ইচ্ছা প্রকাশ করেন, তখন, তকে প্রস্তাব বলা হয়। চুক্তি আইনের ২(খ) ধারা মতে-যার কাছে প্রস্তাব প্রদত্ত হয়েছে সে প্রস্তাবটি কোন পরিবর্তন, সংশোধন, সংযোজন বা বিয়োজন ছাড়াই গ্রহণ করলে অথবা প্রস্তাবের প্রতি হুবহু সায় প্রদান করলে তাকে স্বীকৃতি বলে। চুক্তি আইনের ২(ঙ) ধারাতে বলা হয়েছে যে, পরস্পরের মধ্যে প্রতিদান গঠনকারী প্রতিটি প্রতিশ্রুতি বা প্রতিশ্রুতিসমূহের সমষ্টিকে সম্মতি বলে। চুক্তি গঠনের ক্ষেত্রে সম্মতির বিষয় বা বিষয়বস্তু সম্পর্কে নিশ্চয়তা থাকতে হবে। কোন চুক্তি গঠনের জন্য আইনগত কোন আনুষ্ঠানিকতার প্রয়োজন হলে তা পালন না করলে চুক্তি বৈধ হবে না। বীমা গ্রহণ করতে হলে বীমা গ্রহীতার বিষয়বস্তুর উপর বীমাযোগ্যস্বার্থ থাকতে হবে। বীমা চুক্তি হলো চূড়ান্ত বিশ্বাসের চুক্তি। ক্ষতিপূরণ করা বীমা চুক্তির একটি উপাদান। বীমার কতগুলো শর্ত আছে, যা উভয় পক্ষকেই বিশেষত; বীমা গ্রহীতাকে পালন করতে হয়; তা না হলে, বীমাকারী তার দায় থেকে মুক্ত হয়ে যেতে পারেন।

পাঠোত্তর মূল্যায়ন: ৭.৪

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১. বীমা চুক্তির মূলভিত্তি কোনটি?
   ক) চুক্তি আইন খ) বীমা আইন
   গ) আর্থ আইন ঘ) কোনটি নয়

২. কোনটি বীমা চুক্তির আওতাভুক্ত নয়?
   ক) প্রস্তাব খ) সম্মতি
   গ) প্রতিদান ঘ) লভ্যাংশ

৩. কোনটি বীমা চুক্তির বিশেষ উপাদানের অংশ?
   ক) প্রস্তাব খ) সম্মতি
   গ) প্রতিদান ঘ) বীমাযোগ্য স্বার্থ

পাঠ- ৫ বীমার নীতিমালা (Principles of Insurance)

উদ্দেশ্য

এ পাঠ শেষে আপনি–

১. বীমা ব্যবসা কি কি নীতিমালার উপর প্রতিষ্ঠিত তা বলতে পারবেন;
২. নীতিমালাগুলো ব্যাখ্যা করতে পারবেন;
৩. বাস্তবে বিভিন্ন নীতিমালার প্রয়োগ করতে পারবেন;

বিষয়বস্তু

বীমা ব্যবস্থার নীতিমালা

বীমা ব্যবস্থা নিম্নলিখিত ছয়টি নীতি উপর প্রতিষ্ঠিত

১. চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের নীতি (Principles of Utmost Good Faith)
২. বীমাযোগ্য স্বার্থের নীতি (Principles of Insurable Interest)
৩. ক্ষতিপূরণের নীতি (Principles of Indemnity)
৪. প্রতিস্থাপনের নীতি (Principles of Subrogation)
৫. অবদানের নীতি (Principles of Contribution)
৬. সম্ভাব্য কারণ নীতি (Principles of Proximate Cause)

চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাসের নীতি (Principles of Utmost Good Faith)

চূড়ান্ড় বিশ্বাস বলতে সর্বোচ্চ বিশ্বাসকে বোঝানো হয়। বীমা চুক্তির জন্য যে সকল উপাদান প্রয়োজন তন্মধ্যে চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস অন্যতম। চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস বীমা ব্যবসার সর্বত্রই বিরাজমান। তাই বীমাকে বিশ্বাসের চুক্তিও বলা হয়। এ নীতি অনুসারে বীমা গ্রহীতা ও বীমাকারী উভয় পক্ষ একে অপরের নিকট প্রয়োজনীয় সকল তথ্য নির্ভুল ও সঠিকভাবে তুলে ধরবেন। বিশেষ করে, এ ক্ষেত্রে বীমা গ্রহীতার দায়িত্ব একটু বেশী। তাই বীমা গ্রহীতার যেসকল তথ্য ঝুঁকি বৃদ্ধি করে, তার পূর্ণ বিবরণী পেশ করতে হবে। তাঁর জানা মতে, এ ধরনের কোন তথ্য ইচ্ছাকৃত বাদ দিলে বা গোপণ করলে পরবর্তীতে প্রকাশ পেলে যে কোন সময় চুক্তি বাতিল হতে পারে।

গুরুত্বপূর্ন তথ্য (Material Facts)

গুরুত্বপূর্ন তথ্য বলতে এমন তথ্যকে বুঝায় যা বীমাকারীকে সিদ্ধান্ড় গ্রহণে প্রভাবিত করে, সে বীমার দায় গ্রহণ করবে কিনা, যদি করে তবে, কি রেটে এবং কি শর্তে বীমার দায় গ্রহণ করবে।

আসলে বীমা গ্রহীতা ও বীমাকারী যে সকল তথ্য প্রদান করে, তার বেশীর ভাগই দেখা যায় না। কোন গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গোপন করল কিনা; তা প্রমাণ করা কষ্ট সাধ্য। তাই, উভয়ই উভয়ের তথ্য সরল বিশ্বাসে মেনে নিতে হয়। তাই উভয়ের দায়িত্ব হলো সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য স্বেচ্ছায় একে অপরের নিকট তুলে ধরা।

যে সকল তথ্য প্রকাশ করা প্রয়োজন তা নিম্নরূপ:

১. এমন সব ঝুঁকি যা সাধারণ ঝুঁকির থেকে বেশী। যার অনুপস্থিতিতে বীমাকারী সাধারণ ঝুঁকি মনে করত, যেমন কোন বসত বাড়ির সাথে কেরসিনের দোকান।
২. বীমা পত্র গ্রহণ করার পেছনে যদি কোন বিশেষ উদ্দেশ্য থাকে, যেমন অতিরিক্ত বেশী বীমা করা, ফলে বীমা থেকে লাভ করা যায়।
৩. এমন তথ্য যা বীমা গ্রহীতার অস্বাভাবিক আচরণ প্রকাশ করে। যেমন, ঘন ঘন বীমা দাবী করা।
৪. এমন তথ্য যা ব্যাতিক্রম প্রকৃতির ঝুঁকি, যেমন করো মারাত্নক কোন ব্যাধি থাকলে তা প্রকাশ করা প্রয়োজন।

যেসকল তথ্য প্রকাশ করার প্রয়োজন নেই, যদি না বিশেষ ভাবে জিজ্ঞাসা না করে।

১. যে তথ্য সর্বসাধারণের জ্ঞাত: যে সকল তথ্য সর্বসাধারণের নিকট জানা আছে, এমন তথ্য প্রকাশ করা জরুরী নয়। যেমন, সমুদ্র পাড়ে প্রতি বছরই জলচ্ছাস হয়- এটা সবারই জানা বিষয়। তাই কোন গুদামের বীমা করার জন্য এধরনের কোন তথ্য প্রকাশ করা, এক্ষেত্রে প্রয়োজন নেই।
২. এমন তথ্য যা ঝুঁকি কমায়: এধরনের তথ্য প্রকাশ না করায় কোন ক্ষতি নেই। যেমন, অগ্নি বীমার ক্ষেত্রে ভবনের কাছাকাছি দমকল বাহিনী আছে, তা জানানোর প্রয়োজন নেই।
৩. এমন তথ্য, যা আইনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। যেমন, কারখানা আইন অনুসারে যে সকল নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার উল্লেখ নিষ্প্রয়জন।
৪. যেসকল তথ্য অনুসন্ধান দ্বারা সহজেই বের করা সম্ভব, এমন তথ্য প্রকাশ করা জরুরী নয়। যেমন জন্ম তারিখ চাওয়া হলে বর্তমান বয়স উল্লেখ না করলেও কোন ক্ষতি নেই। কারণ, জন্ম তারিখ থেকে সহজেই বর্তমান বয়স বের করা যায়।
৫. সে সকল তথ্য যা বীমাকারী খুব বেশী গুরুত্ব সহকারে বিবেচনা করছে না, যেমন একটি বীমা প্রস্তাব ফর্মে বীমাগ্রহীতা কোন - চিহ্নি দিল এবং বীমাকারী পূন: কোন প্রশ্ন উত্থাপন করলা না। এতে প্রমাণ হয় যে বীমাকারী উক্ত বিষয়ে তেমন গুরুত্ব দিচ্ছেনা এবং এটা এড়িয়ে যাওয়া যায়।
৬. বীমার শর্ত দ্বারা যেসকল তথ্য নিয়ন্ত্রিত, সে সকল তথ্য প্রকাশ করা প্রয়োজন নেই।

বীমার দায় গ্রহণ ও দাবী পূরণের ক্ষেত্রে মতবাদের প্রয়োগ (Application of the Doctorine in Underwriting and Claim):

বীমা একটি অস্পর্শনীয় প্রকৃতির চুক্তি। একজন বীমাকারী ঝুঁকি গ্রহণ করতে পারবে না বা যথাযথ সিদ্ধান্ত গ্রহন করতে পারবে না, যদি না প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যথাযথভাবে প্রকাশ না করা হয়। একজন বীমাকারী একজন আমানতদার। তার সব গ্রাহক যদি বীমা সংশ্লিষ্ট তথ্যাদি সঠিক ও নির্ভুলভাবে প্রকাশ না করে; তবে ঝুঁকির প্রকৃত মূল্যায়ন করা যাবে না। ফলে প্রকৃত ও সঠিক প্রিমিয়াম নির্ধারণ অসম্ভব হবে। যার দরুন বেশী ঝুঁকিপূর্ণ বিষয়ে অপেক্ষাকৃত কম প্রিমিয়াম ও ভাল ঝুঁকির জন্য অপেক্ষাকৃত বেশী প্রিমিয়াম কার্যকর হতে পারে। ফলে তহবিলের স্বল্পতার কারণে ভাল গ্রাহকগণের বীমার দাবী পরিশোধ সম্ভব নাও হতে পারে।

তাই, যে কোন বীমা পলিসির মেয়াদ কালের প্রতিটি গুরুত্বপূর্ণ তথ্য যথাযথভাবে প্রকাশ করা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এটা কোন যুক্তি নয় যে, জিজ্ঞাসা করা হয়নি বলে তথ্য সরবারহ করা হয়নি। বরং একজন বীমা গ্রহীতা যে সকল তথ্য প্রকাশ করা গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করে তা প্রকাশ করা আবশ্যক। তাই, তার উচিৎ একজন বীমা দায় গ্রহীতাকে বিচার করে কোনো ঝুঁকি গ্রহণ করবে কিনা বা করলে কি শর্তে করবে সে সর্ম্পকে প্রয়োজনীয় সকল গুরুত্বপূর্ণ তথ্য সরবারহ করে সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে সাহায্য করা। এটাই স্বাভাবিক যে, ভাল ঝুঁকি কম প্রিমিয়াম দেবে, আর খারাপ ঝুঁকি বেশী প্রিমিয়াম দেবে। তাই যদি প্রয়োজনীয় গুরুত্বপূর্ণ সকল তথ্য প্রকাশ করা না হলে এ নীতি প্রয়োগ করা যাবে না। এ দায়িত্ব পালানে কোন পক্ষ ব্যর্থ হলে বীমার আইনগত অবস্থা প্রশ্নের সম্মুখীণ হবে।

বীমাযোগ্য স্বার্থের নীতি (Principle of Insurable Interest)

বীমাযোগ্য স্বার্থের নীতি অনুসারে একটি বীমা চুক্তি হতে হলে বীমাকৃত বিষয়বস্তুতে বীমা গ্রহীতার বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকা আবশ্যক। বীমাযোগ্য স্বার্থ ব্যতিত কোন বীমা চুক্তি হলে, তা বাজী ধরার চুক্তি হবে; বীমা চুক্তি হবে না। তাই বীমাযোগ্য স্বার্থ বীমা চুক্তির একটি অবশ্যকীয় শর্ত। বীমাযোগ্য স্বার্থ বলতে কোন বীমা গ্রহীতার কোন বিষয়বস্তুর সাথে আর্থিক বৈধ সম্পর্ককে বুঝায়। এ নীতি সকল বীমার ক্ষেত্রেই অপরিহার্য শর্ত।

বীমাযোগ্য স্বার্থের অপরিহার্য উপাদানগুলো নিম্নরূপ:

১.বিষয়বস্তুর অস্তিত্ব থাকতে হবে: বীমা চুক্তি করতে হলে বীমা গ্রহীতা যে বিষয়ে বীমা করতে চায়, সে বিষয়বস্তু বাস্তবে বিরাজমান থাকতে হবে। কোন কাল্পনিক বা অবাস্তব বিষয়ে বীমা করা যায় না। অর্থাৎ বিষয়বস্তুর অবস্থান ও অস্তিত্ব থাকতে হবে। যেমন- মানুষ, ভবন, জাহাজ, মাল পত্র, ইত্যাদি বিষয়ে বীমা করা যাবে।

২. আর্থিক সম্পর্ক থাকতে হবেঃ যে বিষয়ে বীমা করতে চায়, সে বিষয়বস্তুর সাথে তাঁর আর্থিক সম্পর্ক থাকতে হবে। আর্থিক সম্পর্ক বলতে বুঝায় উক্ত বিষয়বস্তুর কোন ক্ষতি হলে তিনি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন আর অক্ষত থাকলে আর্থিকভাবে লাভবান হবেন। যেমন ধরুন, জনাব খবিরের একটি বাড়ী আছে। এটা থেকে সে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে। বাড়ীটি ধ্বংস হলে তিনি আর্থিকভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হবেন।

৩. এ আর্থিক সম্পর্ক আইন দ্বারা বৈধ হতে হবেঃ কোন বিষয়বস্তুর সাথে যে সম্পর্ক তা আইনত বৈধ হতে হবে, নতুবা তা বীমাযোগ্য স্বার্থ আছে বলে ধরা হবে না। যেমন, মারুফ একটি জাহাজ ছিনতাই করে নিজের কাছে এনে ভাড়ায় চালাচ্ছে। এটা একটি বিষয়বস্তু যার অস্বিত্ব আছে। মারুফ বর্তমানে এটা থেকে আর্থিকভাবে লাভবান হচ্ছে, কিন্তু এ বিষয়বস্তুটির আর্থিক সম্পর্ক বৈধ নয়। তাই অর্থনৈতিক সর্ম্পকটা অবৈধ নয় বলে উক্ত বিষয়ে বীমা করা যাবে না।

এবার আসুন আমরা আরো কিছু বীমাযোগ্য স্বার্থ সম্পর্কে জেনে নেই।

বীমাযোগ্য স্বার্থের উদাহরন

১. মালিকঃ কোন বিষবস্তুর মালিক, উক্ত বিষয়ের উপর বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকে।
২. অংশীদার বা যৌথ মালিকঃ তাদের অংশের উপর বীমাযোগ্য স্বার্থ আছে।
৩. বন্ধক দাতা/বন্ধক গ্রহীতাঃ যিনি কোন সম্পদ বন্ধক দেন তার উক্ত বিষয়ে বীমাযোগ্য স্বার্থ আছে, আবার যিনি বন্ধক গ্রহণ করেন, তাঁরও উক্ত বিষয়ে বীমাযোগ্য স্বার্থ আছে।
৪. জামিন গ্রহীতাঃ একজন জামিন গ্রহীতার গচ্ছিত বস্তুর উপর বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকে।
৫. বাহকঃ একজন বাহক, যে মালামাল সে বহন করছে, তার উপর বীমাযোগ্য স্বার্থ আছে।
৬. প্রশাসক, নির্বাহী, এবং ট্রাষ্টির আইনগতভাবে তাদের অধীনস্ড় সম্পদের উপর বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকে।
৭. জীবনঃ নিজের জীবন, স্ত্রী প্রভৃতি উপর বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকে।
৮. ঋণ দাতা ও ঋণ গ্রহীতা উভয় উভয়ের উপর বীমা করতে পারে।
৯. বীমাকারী বীমাকৃত বিষয়বস্তুর উপর বীমাযোগ্য স্বার্থ সংরক্ষণ করে।
১০. দায়ঃ যেমন মালিক শ্রমিকদের জীবনের উপর বীমা করতে পারে।

কখন বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকতে হবে (When Insurable Interest Must Exist)

নৌ-বীমাঃ নৌ বীমার ক্ষেত্রে যখন বীমার দাবী করবে, তখন বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকা আবশ্যক। যখন বীমা পত্র গ্রহণ করে, তখন বীমাযোগ্য স্বার্থ না থাকলেও বীমা করা যায়।

অগ্নিবীমাঃ অগ্নিবীমার ক্ষেত্রে বীমাপত্র গ্রহণ ও বীমার দাবী করা, উভয়র সময়ই বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকতে হবে।

জীবনবীমাঃ জীবনবীমার ক্ষেত্রে বীমা গ্রহণ করার সময় বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকতে হবে। বীমা দাবীর সময় বীমাযোগ্য স্বার্থ না থাকলেও আইনগত অসুবিধা নেই। যেমন মি:রবিন তার স্ত্রী নাজমার উপর একটি জীবন বীমা পত্র গ্রহণ করে। কিছু দিন পর নাজমার সাথে তার সম্পর্ক বিচ্ছিন্ন হয়ে যায়। বীমা চলাকালে নাজমা মারা যায়। এক্ষেত্রে জনাব রবিন বীমার দাবী আদায় করতে পারবেন।

দুর্ঘটনা বীমাঃ দুর্ঘটনা বীমার ক্ষেত্রে বীমাপত্র গ্রহণ ও বীমার দাবী করা, উভয় সময়ই বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকতে হবে।

ক্ষতিপূরণের নীতি (Principle of Indemnity)

বীমা চুক্তিকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়। বীমার মূল উদ্দেশ্য হলো কারো কোন আর্থিক ক্ষতি হলে তা পূরণ করে দেয়া অর্থাৎ আর্থিকভাবে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা। একটু কমবেশি করা যাবে না। বীমা করে কাউকে লাভবান হবার সুযোগ দেয়া হয় না। তাই বীমাকৃত বিষয়ে যে ক্ষতি হবে, ঠিক ততটুকু ক্ষতিপূরণ করা হবে। এ নীতি বীমা ব্যবসাকে সঠিক পথে পরিচালিত করতে সাহায্য করে। তবে, এ নীতি জীবন বীমার ক্ষেত্রে প্রযোজ্য নয়। কারণ জীবনের মূল্য টাকা দিয়ে পরিমাপ করা যায় না। তাই, অনুরূপভাবে অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উপর বীমার ক্ষেত্রেও ক্ষতিপূরণের নীতি প্রযোজ্য নয়। জীবন ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গের বীমা ব্যতিত অন্যান্য বীমার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের নীতি প্রযোজ্য।

ক্ষতিপূরণের নীতি মানুষের নৈতিক ঝুঁকি রোধ করে, যার ফলে কোন বীমা গ্রহীতা ওভার বা আন্ডার ইন্স্যুরেন্স থেকে বিরত থাকে। ফলে যা ক্ষতি হয় তাই ক্ষতিপূরণ দেয়া হয়।

ক্ষতিপূরণের নীতির প্রয়োগ (Application of Imdemnity Principles)

জীবন: জীবন বীমা ও ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের চুক্তি প্রযোজ্য নয়।

নন লাইফ (Non life): জীবন ও ব্যক্তিগত বীমা ব্যতিত অন্যান্য বীমার ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের নীতি প্রযোজ্য। তাই নৌ, অগ্নি, মটর গাড়ী, চোর্য, কর্মচারী দায়, অলিক দায়, এভিয়েসন, ইঞ্জিনিয়ারিং, পণ্য দায়, শস্য, গবাদী পশু ইত্যাদি সকল ক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণের নীতি প্রযোজ্য।

অতিরিক্ত, বিশেষ সুবিধা ও গড়ঃক্ষতিপূরণ নীতির উপর এগুলোর প্রভাব (Excess, Franchise and Average: their Impact in the Principles of Indemmity)

Excess: এর অর্থ হলো কোন ক্ষতি হলে পূর্ব নির্ধারিত একটি পরিমাণ বাদ দিয়ে যদি কিছু বেঁচে থাকে, তাহলে ক্ষতির অবশিষ্ট পরিমাণ ক্ষতিপূরণ হিসেবে প্রদান করা হবে। যেমন:

উদাহরণ ১:

অতিরিক্ত	১০০টাকা
ক্ষতি	২০০টাকা
ক্ষতিপূরণ প্রদান =	১০০টাকা

উদাহরণ ২:

অতিরিক্ত	১০০
ক্ষতি	১০০
ক্ষতিপূরণ	০

এক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে পুর ক্ষতিপূরণ পাচ্ছে না। এর অর্থ হলো যাতে একজন বীমা গ্রহীতা ঘন ঘন ছোটখাট ক্ষতিপূরণ দাবী থেকে বিরত থাকে।

Franchise: এ নিয়ম অনুসারে ক্ষতিপূরণ পেতে হলে অন্ড়ত একটি পূর্ব নির্ধারিত পরিমাণ নূন্যতম ক্ষতি হতে হবে। যদি সে পরিমাণ ক্ষতি হয়; তবে, পুরো ক্ষতিপূরণ পাবে। আর যদি ক্ষতির পরিমাণ নূন্যতম পর্যায়ে না হয় তবে কোন ক্ষতিপূরনই পাবে না।

উদাহরণ ১:

ফ্রেনসাইস	১০০ টাকা
ক্ষতি	৯৯ টাকা
প্রদেয়	০ টাকা

উদাহরণ ২:

ফ্রেনসাইস	১০০ টাকা
ক্ষতি	২০০ টাকা
প্রদেয়	২০০ টাকা

গড় (Average) গড় এমন একটি পদ্ধতি যার মাধ্যমে আন্ডার ইন্সিরেন্স পরাজিত করা সম্ভব। বীমার নিয়ম হলো সব সময় পূর্ণ মূল্যে বীমা করা। তার বেশীও না কমও না। কম মূল্যে বীমা করলে কম প্রিমিয়াম দিয়ে বেশী ঝুঁকি হস্তান্তর করার সুযোগ থাকে।

গড় আবার তিন রকম যথা:

১) আনুপাতিক বা প্রোরেটা কন্ডিশন অব এভারেজ (Pro-rata condition of average): বীমাকৃত বিষয়বস্তু ক্ষতিগ্রস্থ হলে যদি দেখা যায় যে, ক্ষতি মূল্য বীমাকৃত মূল্য থেকে বেশী তাহলে আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ করা হবে। অর্থাৎ প্রকৃত খরচের আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ পাবে।

উদাহরণ:

বীমাকৃত মূল্য টাকা ১০,০০০ পলিসি দেবে $\frac{10,000}{20,000} \times 100$

প্রকৃত মূল্য টাকা ২০,০০০ = ৫,০০০ টাকা

২) বিশেষ বা স্পেশাল কন্ডিশন অব এভারেজ (Special Condition of Average): এটাকে ৭৫% কন্ডিশন অব এভারেজও বলা হয়। এ গড় পড়তা নিয়ম হিসেবে বিষয়বস্তুর ক্ষতি সাধনের সময় যদি দেখা যায় যে বীমার বিষয়বস্তুর অন্তত: ৭৫ ভাগ মূল্য বা ততোধিক বীমাকৃত, তা হলে প্রকৃত ক্ষতি পুরোটাই প্রদান করবে। যদি ৭৫% কম মূল্যে বীমা করা হয়, তবে আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ করা হবে।

উদাহরণ ১:

বীমাকৃত মূল্য	৭,৫০০
প্রকৃত মূল্য	১০,০০০
ক্ষতি	১,০০০
পরিশোধিত মূল্য	১০০০

উদাহরণ ২:

বীমাকৃত মূল্য	৭০০০
প্রকৃত মূল্য	১০০০০
ক্ষতি	১০০০

পরিশোধিত মূল্য $\frac{7000}{10\ ,000} \times 1000$

= ৭০০ টাকা

এ পদ্ধতি প্রযোজ্য হবে যে ক্ষেত্রে মূল্য উঠানামা করে যেমন মজুদ মাল।

৩) দ্বি-শর্ত গড় (Two-Condition of Average): এ পদ্ধিতির দু'টি অংশ থাকে। প্রথম অংশ প্রোরেটা কন্ডিসন অব এভারেজ এবং অপর অংশে বলা হয়েছে যে যদি বীমাকৃত বিষবস্তুটি ক্ষতি হবার সময় কোন সুনির্দিষ্ট বীমাপত্র থাকে, তবে সেটা প্রথম পরিশোধ করার পর যদি ক্ষতি বাকী থাকে তাহলে সাধারণ গড় পড়তা হিসাবে ক্ষতিপূরণ করতে হবে। তাই এ নিয়মটি প্রয়োগ করা হলে একটি বিষয়বস্তুর উপর দুটি বীমা পলিসি থাকতে হবে। যেমন ধরুন:

উদাহরণ ১: বীমা পলিসি ÒA" বীমাকৃত মূল্য ১,০০০ টাকা সম্পদ i ও ii (2 Con of Av) (Two Condition of Average)

পলিসি 'B' এর বীমাকৃত মূল্য	৭০০টাকা
A সম্পদের প্রকৃত মূল্য: সম্পদ I	১০০০টাকা
B সম্পদের প্রকৃত মূল্য: সম্পদ II	১০০০টাক
সম্পদের প্রকৃত ক্ষতি: সম্পদ I	৫০০ টাকা

এক্ষেত্রে B পলিসির প্রথম ৫০০ টাকা পরিশোধ করবে।
যেহেতু পুরটাই পরিশোধিত তাই ÔAÕ পলিসিকে কিছুই দিতে হবে না।

উদাহরণ ২:
ক্ষতির পরিমাণ: সম্পদ **A** টাকা ১০০০
অন্যান্য অবস্থা অপরিবর্তিত আছে।
পলিসি ÔBÕ প্রথম ৭০০ টাকা পরিশোধ করেন ।
পলিসি ÔAÕ দিবে

$\frac{1000}{2000} \times 300$ (বাকী ক্ষতি)	=	১৫০ টাকা
বীমা গ্রহীতা বহন করবে	=	১৫০ টাকা
মোট	=	৩০০ টাকা

উপরিউক্ত তিনটি গড় পদ্ধতি থেকে দেখা গেল যে, যদি প্রকৃত মূল্য অপেক্ষা কম মূল্যে বীমা গ্রহণ করা হয়, তবে আনুপাতিক হারে ক্ষতিপূরণ পাবে, যা বীমা গ্রহীতার ক্ষতি বহন করতে হবে। ফলে কম বীমা করার প্রবনতা থাকবে না।

ক্ষতিপূরণ করার পদ্ধতি (Methods of Providing Indemnity)

ক্ষতিপূরণ করার নিম্নবর্ণিত চারটি পদ্ধতির প্রচলন রয়েছে:

১) নগদ পরিশোধ (Cash Payment): এটাই ক্ষতিপূরণের স্বাভাবিক ও সাধারণ পদ্ধতি; যা, সহজ ও কম ঝামেলাপূর্ণ।

২) মেরামত (Repair): নগদ টাকার পরিবর্তে ক্ষতিগ্রস্থ সম্পদকে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনার জন্য প্রয়োজনীয় রিপিয়ারের ব্যবস্থা করা।

৩) প্রতিস্থাপন (Replacement): সাধারণত: সম্পদের সামগ্রিক ক্ষতির ক্ষেত্রে এ ব্যবস্থাগ্রহণ করা হয়। ধ্বংশকৃত বস্তুটির অনুরূপ গুনাগুন, বয়স ও মানের আর একটি বস্তু প্রদান করা হয়।

৪) পূন:প্রতিষ্ঠিত করা (Re-instalment): এটাও সামগ্রীক ক্ষতির ক্ষেত্রে হয়ে থাকে। যেমন কোন ভবন আগুনে পুড়ে গেলে বা ভূমিকম্পে ধ্বংশ হয়ে গেলে, অনুরূপ একটি ভবন পূন:নির্মাণ করে দেয়া।

স্থলাভিষিক্ততার নীতি (Principle of Subrogation)

এ নীতির অর্থ হলো একজনের স্থলে অন্যজনকে স্থাপন করা। বীমার ক্ষেত্রে যখন একজন বীমাকারী কোন সম্পদের সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেবার পর যদি কিছু অবশিষ্ট থাকে, তার মালিক বীমা গ্রহীতা না হয়ে বীমাকারী হবে। যেমন, ধরুন 'ক' একটি গাড়ী ৫,০০,০০০ টাকায় 'খ' কোম্পানীর সাথে বীমা করে। সড়ক দুর্ঘটনায় গাড়ীটি ধ্বংশ হয়। চুক্তি অনুযায়ী বীমা কোম্পানী গাড়ীটি বাবদ ৫ লক্ষ টাকা ক্ষতি পূরণ প্রদান করে। আর ধ্বংশপ্রপ্ত গাড়ীটি বিক্রি করে ৫০,০০০ টাকা পাওয়া যায়। এক্ষেত্রে এ নীতি অনুযায়ী উক্ত ৫০,০০০ টাকার দাবীদার বীমাকারী বীমা গ্রহীতা নয়। আবার অনেক সময় বীমাকৃত সম্পদ তৃতীয় পক্ষের দ্বারা ক্ষতিগ্রস্থ হয়। সেক্ষেত্রে বীমাকারী ক্ষতিপূরণ দেয়। আবার তৃতীয় পক্ষও তাঁর অপরাধের জন্য ক্ষতিপূরণ দেয়। এক্ষেত্রে বীমাকারী যদি পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেয় তবে তৃতীয় পক্ষ থেকে প্রাপ্ত ক্ষতিপূরণের টাকা বীমাকরীকে দিতে হবে। তবে, জীবন বীমা ও ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমার ক্ষেত্রে এ নীতি প্রয়োগযোগ্য নয়। কারণ, এ গুলো ক্ষতিপূরণের চুক্তি নয়।

কি ভাবে স্থলাভিষিক্তের অধিকার জন্মায় (How the Rights of Subrogation Arises)

নিম্নলিখিত তিনভাবে প্রতিস্থাপনের অধিকার জন্মায়:

১. ক্ষতি আইন দ্বারা (Under Tort): এটার অর্থ হলো অপরের দ্বারা অন্যায় সংঘটিত হওয়া। কোন পক্ষ অন্য পক্ষকে ক্ষতি করার অধিকার রাখে না। যদি কোন ব্যক্তির সম্পদ তৃতীয় কোন পক্ষ দ্বারা অন্যায় ভাবে ক্ষতিগ্রস্থ হয় তবে ক্ষতিসাধনকারী ব্যক্তিকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়।

২. চুক্তি দ্বারা (Under Contract): কিছু কিছু চুক্তি আছে যা ভঙ্গ করলে এক পক্ষ অন্য পক্ষকে ক্ষতিপূরণ দিতে হয়। যেমন গচ্ছিত চুক্তি। গচ্ছিত গ্রহীতা গচ্ছিত দ্রব্য সংরক্ষণ করতে ব্যর্থ হলে ক্ষতিপূরণ প্রদানের জন্য দায়ী থাকবে।

৩. বিধিবদ্ধ আইন দ্বারা (Under Statute): আইন দ্বারাও ক্ষতিপূরণের দায় সৃষ্টি হতে পারে, যদি আইন ভঙ্গ করে। যেমন কারখানা আইন, সমুদ্রে মাল পরিবহন আইন ইত্যাদি আইনের মাধ্যমে ক্ষতিপূরণের দায় সৃষ্টি হয়।

দাবীপূরণে স্থলাভিষিক্ততা নীতির প্রয়োগ (Application of Subrogation in Claim)

স্থলাভিষিক্ততার নীতি প্রয়োগের জন্য নিম্নলিখিত বিষয়গুলো অনুধাবন করতে হবে:

১. কখন স্থলাভিষিক্ততার উদ্ভব হয় (When Subrogation Arises): সাধারণ আইন এবং চুক্তির শর্তাবলীর মধ্যে কিছু পার্থক্য আছে। সাধারণ আইন অনুযায়ী প্রথম বীমাকারী তৃতীয় পক্ষের নিকট ক্ষতিপূরণের জন্য যেতে পারেন। তবে শুধু মাত্র বীমাগ্রহীতার ক্ষতিপূরণের পরই তৃতীয় পক্ষের নিকট ক্ষতিপূরণের জন্য যেতে পারেন। চুক্তির শর্তাবলীর কারণে এ অবস্থার পরিবর্তন হতে পারে। নন-মেরিস পলিসিতে সাধারণত:শর্ত থাকে যা 'স্থলাভিষিক্ত শর্তনামে পরিচিত। এ শর্ত অনুসারে বীমাকারী বীমাগ্রহীতাকে প্রথম তৃতীয় পক্ষ থেকে ক্ষতিপূরণ আদায় করার কথা বলবে। তারপর যদি ক্ষতিপূরণ বাকী থাকে, তা বীমাকারী বহন করবে। যা সাধারণ আইনকে পরিবর্তন (Modify) করে। কিন্তু নৌবীমার ক্ষেত্রে বীমাকারী ক্ষতিপূরণ দেবার পরই মাত্র স্থলাভিষিক্ততার অধিকার জন্মায়।

২. স্থলাভিষিক্ততার পরিমাণ (Extent of Subrogation): বীমা গ্রহীতা যে পরিমাণ আর্থের বীমা করেছে, শুধুমাত্র সে পরিমাণ ক্ষতিপূরণ পাবার অধিকারী। তার বেশী ভোগ করতে পারবে না। বীমাকৃত অর্থের বেশী ক্ষতিপূরণ পেলে বীমাকারীকে তা দিয়ে দিতে হবে। কম হলে বীমাকারীর নিকট থেকে আদায় করতে পারবে।

উদাহরণ ১:

বীমাকারী দিল	১,০০০টাকা
আদায় করল	১,২০০টাকা
বীমাকারী রাখবে	১,০০০টাকা

অতিরিক্ত ২০০ টকা বীমা গ্রহীতাকে ফেরত দিবে।

উদাহরণ ২:

বীমাকারী দিল	১,০০০ টাকা
আদায় করল	৮০০ টাকা

বীমাকারী পূর্ণ অর্থ রাখবে। বীমাকারীকে ২০০ টাকা ফেরত দিতে হবে না

উদাহরণ ৩:

প্রকৃত ক্ষতি	১০০০ টাকা
বীমাগ্রহীতা তৃতীয় পক্ষ থেকে পেল	১০০০ টাকা

অতএব বীমা গ্রহীতার বীমাকারীর নিকট কোন দাবী থাকবে না। তবে যদি বীমা গ্রহীতা ৭০০ টাকা আদায় করত, সেক্ষেত্রে বীমা গ্রহীতা বীমাকারীর নিকট থেকে বাকী ৩০০ টাকা আদায় করতে পারবে।

উদাহরণ ৪:

প্রকৃত ক্ষতি	১,০০০ টাকা
বীমাকারী দিল	৯০০ টাকা

বীমাগ্রহীতা তৃতীয় পক্ষ থেকে ৭০০ টাকা আদায় করল। এক্ষেত্রে বীমা গ্রহীতা বীমাকারীকে ৬০০ টাকা ফেরত দিবে।

৩. এক্স গ্রেসিয়া পেমেন্ট (Ex-gratia Payment): এর অর্থ হলো, যখন কোন ক্ষতির জন্য কোন বীমাকারী আইন অনুযায়ী কোন ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য নয় কিন্তু বীমাকারী বীমাগ্রহীতার সাথে সম্পর্ক মজবুত করার জন্য তাকে কিছু পরিমাণ টাকা প্রদান করতে পারে। এ ক্ষেত্রে, প্রাপ্ত অর্থকে Ex-gratia Payment বলা হবে। যা অন্য কোন গ্রাহক উদাহরণ হিসেবে নিতে পারবে না। এ ধরনের ক্ষতি বাবদ অর্থ প্রদান নিছক ব্যক্তিগত ইচ্ছা মাত্র। এরূপ পরিস্থিতিতে অন্য আর একটি বীমাকারী একই বিষয়ে ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ প্রদান করলে, এ ক্ষেত্রে যদি দুটি প্রাপ্তি মিলে মোট ক্ষতির পরিমাণ থেকে বেশী হয়, তবে বাকী অংশ ক্ষতিপূরণ বাবদ অর্থ প্রদানকারী বীমাকারীকে ফেরত দিতে হবে। উদাহরণস্বরূপ মনে করুন, মিঃ জামান তার গাড়ীটি 'ক' কোম্পানীর সাথে ১,০০,০০০ টাকায় এবং 'খ' কোম্পানীর সাথে ৭৫,০০০ টাকায় বীমা করে। গাড়ীটি দুর্ঘটনা কবলিত হয়, যার ফলে রিপিয়ার বাবদ ৫,০০০ টাকা খরচ হয়। বীমা চুক্তির শর্ত অনুসারে 'ক' কোম্পানী মিঃ জামানকে ৫,০০০ টাকা ক্ষতিপূরণ হিসেবে পরিশোধ করে। 'খ' কোম্পানীর চুক্তি অনুসারে কোন ক্ষতিপূরণ দিতে আইনগত বাধ্যবাধকতা না থাকা সত্বেও মিঃ জামানকে ১,০০০ টাকা পরিশোধ করে। মিঃ জামান যেহেতু তার ক্ষতিপূরণের পুরো টাকাই পেয়েছে, তাই এই ১,০০০ টাকা এ নীতি অনুসারে 'ক' কোম্পানীকে দিতে হবে।

স্থলাভিষিক্ত নীতি অনুধাবন করার জন্য 'স্যালভেজ মূল্য (Salvage Value) ও পরিত্যক্ততা' (Abandonmat) সম্পর্ক জানা থাকা প্রয়োজন। নিম্নে এ দুটি বিষয়ের উপর আলোচনা করা হলো:

স্যালভেজ (Salvage): স্যালভেজ বলতে কোন দ্রব্য বা সম্পদ সম্পূর্ণ ক্ষতি হবার পর যা থাকে তা। সাধারণত: কোন বস্তুই সম্পূর্ণ ধ্বংশ হয় না, কিছু না কিছু বাকী থেকে যায়। আবার আংশিক ক্ষতির ক্ষেত্রে কোন বীমা গ্রহীতা ক্ষতির চেয়ে বেশী দাবী করতে পারে না। তবে যদি বীমা গ্রহীতা আংশিক ক্ষতির ক্ষেত্রে বাকী অংশের দাবী ছেড়ে দিয়ে পূর ক্ষতিপূরণের জন্য আবদার করে এবং বীমাকারী যদি তাতে রাজী হয়, সেক্ষেত্রে বীমা গ্রহীতা পুরো ক্ষতিপূরণ পাবে এবং উক্ত সম্পদের বাকী অংশের মালিক বীমাকারী হবে।

তবে, অনেক সময় Salvage value- র মালিকানা নিয়ে দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, যখন আন্ডার ইন্সিরেন্স করা হয় এবং সামগ্রিক ক্ষতি হয়। যেহেতু বীমা গ্রহীতাকে সম্পূর্ণ ক্ষতিপূরণ দেয়া হয় না। সেক্ষেত্রে যদি প্রদত্ত ক্ষতিপূরণ এবং Salvage Value বীমাগ্রহীতা পাবে। তবে প্রদত্ত ক্ষতিপূরণের পরিমাণ ও স্যালভেজ মূল্য মিলে কোন অবস্থাতেই প্রকৃত মোট ক্ষতির বেশী হবে না। যদি বেশী হয়, তখন অতিরিক্ত অর্থ বীমাকরীকে ফেরত দিতে হবে।

পরিত্যক্ত (Abandonment) পরিত্যাক্ত বা Abandonment হলো, যখন কোন বীমাকৃত বিষবস্তু ধ্বংশ হবার পর উহার মালিকানা স্বত্ব ত্যাগ করে মোট ক্ষতি দাবী করা হয়। এটা নৌ-বীমার ক্ষেত্রে খুব বেশী প্রচলন রয়েছে। নৌবীমার ক্ষেত্রে বীমাগ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্থ বস্তুর স্বত্ব ত্যাগ করে মোট ক্ষতি দাবী করে। তাই বলা যায়, যখন কোন বীমাগ্রহীতা তার বীমাকৃত বিষয়বস্তু ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তখন ক্ষতিগ্রস্থ বস্তুর স্বত্ব ত্যাগ করে মোট ক্ষতিপূরণের জন্য দাবী করে। এখানে বীমাগ্রহীতা ক্ষতিগ্রস্থ বস্তুর স্বত্ব ত্যাগ করাকে পরিত্যক্ত বা Abandonment বলা হয়। এটার মালিক তখন বীমাকারী হয়ে যায়।

অবদান নীতি (Principle of Contribution)

অবদানের নীতি বলতে যখন কোন একটি বিষয়বস্তুর উপর একাধিক বীমা পত্র গ্রহণ করে এবং ক্ষতিগ্রস্থ সকল বীমাকারীগণ মিলিতভাবে ক্ষতিপূরণ করবে; যাতে বীমাগ্রহীতা একই বিষয়বস্তু বীমা করে মোট ক্ষতির বেশী আদায় করতে না পারে। এটি ক্ষতিপূরণ নীতির অনুরূপ। এ নীতির মূল উদ্দেশ্য হলো কোন বীমাগ্রহীতা যেন একই বিষবস্তুর উপর একাধিক বীমা করে ক্ষতির চেয়ে বেশী দাবী আদায় করতে না পারে। তবে এ নীতিটিও জীবন বীমা ও ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমার বেলায় প্রযোজ্য নয়। ক্ষতিপূরণের নীতি যেক্ষেত্রে প্রযোজ্য, অবদানের নীতিও সে সকল ক্ষেত্রে প্রযোজ্য।

অবদান নীতি কখন প্রযোজ¨ (When Contribution Operates)

অবদান নীতি প্রয়োগের পূর্ব শর্তগুলো নিম্নরূপ:

১. একের অধিক বীমা পলিসি থাকতে হবে। এবং সকল পলিসি বলবৎযোগ্য থাকতে হবে।

২. সকল পলিসি একই বিষয়বস্তুর উপর হতে হবে। যদি শুধুমাত্র একই বীমাগ্রহীতা কর্তৃক ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ের উপর বীমা করা হয়, তাহলে হবে না। একই বিষবস্তুর উপর একাধিক বীমা পলিসি হতে হবে।

৩. সকল পলিসি একই ঝুঁকির উপর বীমা করতে হবে। একই বিষয় বস্তুর উপর একাধিক পলিসি যদি ভিন্ন ভিন্ন ঝুঁকির উপর করা হয়, তবে অবদানের নীতি কার্যকর করা যাবে না।

৪. সকল পলিসি একই বীমাগ্রহীতার একই বীমাযোগ্য স্বার্থ হতে হবে। মনে করুণ কবীরের একটি গাড়ী আছে; সে তার গাড়ীটি খবিরের নিকট বন্ধক রেখে ঋণ গ্রহণ করল। এ ক্ষেত্রে উভয়েরই বীমাযোগ্য স্বার্থ অর্জন হলো। যদি তারা পৃথক পৃথকভাবে বীমা পলিসি গ্রহণ করে এবং গাড়ীটি ক্ষতিগ্রস্থ হয়, তবে উভয়ই পৃথক পৃথকভাবে ক্ষতিপূরণ পাবে। এক্ষেত্রে অবদানের নীতি প্রযোজ্য হবে না। কারণ হলো স্বার্থ ভিন্ন ও বীমা গ্রহীতাও ভিন্ন। যদি উপরের কোন একটি শর্ত পূরণে ব্যর্থ হয় তবে অবদানের নীতি প্রয়োগ করা যাবে না।

কি ভাবে অবদান নীতি কাজ করে (How Contribution Works)

এখন প্রশ্নহলো অবদান নীতি কিভাবে কাজ করে? সাধারণত; আনুপাতিক হারে সকলে ক্ষতিপূরণ প্রদান করে থাকে।

Formula:

$$\frac{\text{Sume Insured Under each Policy}}{\text{Total Sum Under all Policy}} \times 100$$

Example 1:

Policy A Sum Insured TK 1,000
Policy B Sum Insured TK 2,000
Policy C Sum Insured TK 4,000
Loss TK 700

The Policy A Pays $\frac{1,000}{7,000} \times 700 = Tk100$

The Policy B Pays $\frac{2,000}{7,000} \times 700 = Tk200$

The Policy C Pays $\frac{4,000}{7,000} \times 700 = Tk400$

Total Pays Tk 700

Example 2:

Policy A covers proparty	I	Sum insured	Tk 2000
Policy A covers proparty	I and II	Sum insured	Tk 4000
Policy A covers proparty	II and III	Sum insured	Tk 8000

Loss Tk 666 to Proparty II

পলিসি A কোন অবদান রাখবে না, কারণ সম্পদ II কাভার করে নাই। এ ক্ষেত্রে পলিসি B and C ক্ষতিপূরণে অবদান রাখবে, যেহেতু এ দুটি পলিসি সম্পদ II কাভার করেছে।

সমাধান:

Policy B Pays $\frac{4000}{10,000} \times 666 =$ Tk 222

Policy C Pays $\frac{6000}{10,000} \times 666 =$ Tk 444

Total Pays Tk 666

Example 3:

Policy	Proparty Insured	Sum Insured	Policy Period	Peri Covered
A	I	2000	1.1.06-31.12.06	Fire
B	I	2000	Do	Lighting
C	I	2000	Do	Fire
D	II	2000	Do	Fire
E	I	2000	1.1.06-30.6.06	Fire

Loss Tk 1000 to Proparty I by Fire on 2.8.06

উপরিউক্ত উদাহরণ ৩ যদি অমারা লক্ষ্য করি তবে দেখা যাবে যে, পলিসিগুলো সব এক রকম নয়। এখানে সম্পদ, পলিসির সময়কাল ও পেরিল (Peril) এর ক্ষেত্রে কিছু পার্থক্য রয়েছে।

তাই নিম্নবর্ণিত ভাবে অবদানের নীতি প্রয়োগ করতে হবে।

পলিসি B এখানে বিবেচনায় আসবে না কারণ এটা অগ্নির উপর বীমা গ্রহণ করা হয়নি। পলিসি 'D' কোন ক্ষতিপূরণ দিবে না, কারণ Proparty I কাভার করে নাই। পলিসি E ক্ষতিপূরণে অবদান রাখবে না কারণ ক্ষতি যখন হয়, তখন এই পলিসির মেয়াদ উত্তীর্ণ হয়েছে। তাই শুধুমাত্র পলিসি A এবং C ক্ষতিপূরণে অবদান রাখবে, যা নিম্নরূপ:

The Policy A Pays $\frac{2,000}{4,000} \times 1000 =$ Tk500

The Policy C Pays $\frac{2,000}{4,000} \times 1000 =$ Tk500

Total Tk 1000

নিকটতম কারণ নীতি (Principle of Proximate Cause)

বীমাকৃত বিষয়বস্তু ক্ষতিগ্রস্থ হলে ক্ষতিপূরণ দেবার পূর্বে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে ক্ষতির কারণ কি? যদি ক্ষতির করণ বীমাকৃত হয়, তবেই শুধু ক্ষতিপূরণ দাবী করা যায়; নতুবা নয়। এক্ষেত্রে নিকটতম কারণটি দূরের কারণ নীতি। যদি কোন ঘটনা ঘটার পেছনে একটি মাত্র কারণ বিদ্যমান থাকে সেক্ষেত্রে জটিলতা কম। এক্ষেত্রে শুধু কারণটি বীমাকৃত কি না তার উপর ভিত্তি করেই ক্ষতিপূরণ দেয়া বা না দেবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। কিন্তু কোন ঘটনা ঘটার পেছনে যদি একাধিক ঘটনা থাকে, সেক্ষেত্রে

'কাছের কারণটি দূরের কারণটি নয়' নীতি প্রযোজ্য হবে। ধরা যাক, আপনি আপনার বন্ধু জহিরকে নৈশ ভোজে নিমন্ত্রণ করলেন। তিনি যথারীতি আপনার বাসায় এসে নৈশ ভোজে অংশ নিলেন। নৈশ ভোজ শেষে তাঁর বাসায় ফেরবার পথে তিনি ছিন্তাইকারী কতৃক আক্রান্ড় হলেন। তাকে ছুরিকাঘাত করা হলো। হসপিটালে নেবার সময় তাঁকে বহনকৃত গাড়ীকে একটি ট্রাক সজোরে ধাক্কা দিলে তিনি ছিটকে পড়ে গেলেন এবং তাৎক্ষনিক মৃত্যুবরণ করলেন। তাঁর এক্ষেত্রে মৃত্যুর নিকটতম কারণ ট্রাক দুর্ঘটনা, ছুরিকাঘাত নয়। অন্য একটি উদাহরণে ধরা যাক, দবির ব্যক্তিগত দুর্ঘটনার জন্য একটি বীমা পলিসি নিয়েছেন। উক্ত বীমার মেয়াদের মধ্যে তিনি একদিন সড়ক দুর্ঘটনায় পতিত হয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। সেখানে তিনি টিটেনাসে আক্রান্ড় হয়ে মারা যান, যার বিরুদ্ধে কোন বীমা পলিসি নেয়া নেই। এক্ষেত্রে তার পরিবার ক্ষতিপূরণ পাবে না। এখানে মৃত্যুর নিকটতম কারণ টিটেনাস- সড়ক দুর্ঘটনা নয়। আর টিটেনাস বীমা দ্বারা কভার করা নেই বিধায় ক্ষতিপূরণ পাবে না।
তাই বলা যায়, নিকটতম কারণ জানতে কোন উকিল বা গবেষককে প্রশ্ন করলে সঠিক উত্তর পাওয়া যাবে না। কারণ তারা কারণের কারণ বের করতে সচেষ্ট থাকে। এখানে কারণের কারণ খোঁজা যাবে না। নিকটতম কারণাটিই ঘটনা ঘটার কারণ বলে বিবেচিত হবে।

নিকটতম কারণ রীতি (Rules of Proximate Caues)

নিকটতম কারণ বের করার জন্য নিম্নলিখিত নীতিগুলো অনুসরণ করতে হবে:

১. একক কারণ (Single Causes): যখন কোন ঘটনা ঘটার জন্য একটি মাত্র কারণ কাজ করে, সেটাই ঘটনার জন্য প্রকৃত কারণ বলে বিবেচিত হবে।

২. একযোগে ঘটনাবলীর কারণসমূহ (Concurrent Causes): ক্ষতি যদি এক সাথে একাধিক কারণে সংঘটিত হয়, সেক্ষেত্রে ক্ষতির বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেবার জন্য ক্ষতির কারণগুলো আলাদা করতে হবে। কারণগুলো আলাদা করণ যোগ্য ও অযোগ্য হতে পারে। সেক্ষেত্রে কারণগুলো আলাদা বা পৃথক করা যায় সেক্ষেত্রে যদি ঘটনাটি বীমাকৃত বিপদ ও অবীমাকৃত উভয় ধরনের বিপদ থেকে ঘটে থাকে তবে বীমাকৃত বিপদ থেকে ক্ষতির পরিমাণ নির্নয় করতে হবে। এবং বীমাগ্রহীতা শুধু মাত্র বীমাকৃত বিপদ থেকে যে পরিমাণ ক্ষতি হয়েছে তার জন্যই ক্ষতিপূরণ পাবে। তবে যদি একসাথে একাধিক কারণে ক্ষতি হয় এবং সেক্ষেত্রে বীমাকৃত ও অবীমাকৃত উভয় প্রকার কারণ থাকে এবং পৃথক করা না যায়, সেক্ষেত্রে বীমা গ্রহীতা কোন ক্ষতিপূরণ পাবে না।

৩. নিরবিচ্ছিন্ন কারণ প্রবাহ (Unbroken Sequence): যদি নিরবিচ্ছন্ন ভাবে কতগুলো কারণে ক্ষতি সাধিত হয়, সেক্ষেত্রে ক্ষতিপূরণ সিদ্ধান্তের জন্য বীমাকৃত ও অবীমাকৃত বিপদ পৃথকভাবে চিহ্নিত করতে হবে। চিহ্নিত করার পর যদি দেখা যায় যে, অবীমাকৃত কারণে ক্ষতির সূত্রপাত হয়েছে এবং বীমাকৃত কারণ পরে যুক্ত হয়েছে, তাহলে বীমাকারী কোন ক্ষতিপূরণ দিতে দায়বদ্ধ থাকবে না। পক্ষান্তরে, ক্ষতির সূত্রপাত যদি বীমকৃত কারণে শুরু হয় ও পরে অবীমাকৃত কারণ যোগ হয়; তাহলে বীমাকারী ক্ষতিপূরণ দিতে বাধ্য থাকবে। কারণ এ ক্ষতির নিকটতম কারণ বীমাকৃত তাই ক্ষতিপূরণ দিতে হবে।

৪. বিচ্ছিন্ন কারন প্রবাহ (Broken Sequence): যেক্ষেত্রে কোন ক্ষতি একই সাথে একাধিক কারণে সংঘটিত হলে তার মধ্যে বিরতি থাকলে বীমাকৃত ও অবীমাকৃত কারণে ক্ষতির পরিমাণ আলাদা আলাদাভাবে নির্ণয় করতে হবে। শুধুমাত্র বীমাকৃত কারণ দ্বারা ক্ষতির জন্য বীমাকারী দায়ী থাকবে; কিন্তু অবীমাকৃত কারণ দ্বারা কোন ক্ষতি হলে তার দায়ভার বীমাকারী বহন করবে না।

উপরের আলোচনা থেকে বোঝা যায় যে, নিকটতম কারণ নির্নয় বেশ জটিল। তাই নিকটতম কারণ নির্নয় বিচক্ষণতা, সর্তকতা ও দক্ষতা একান্ত প্রয়োজন। তা না হলে বীমার দাবী পূরণে দু পক্ষের মধ্যে মতপার্থক্য ও জটিলতা দেখা দিবে।

পাঠ সংক্ষেপ: ৭.৫

চূড়ান্ত বিশ্বাস বলতে সর্বোচ্চ বিশ্বাসকে বোঝানো হয়। বীমা চুক্তির জন্য যে সকল উপাদান প্রয়োজন তন্মধ্যে চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস অন্যতম। এমন তথ্য, যা আইনের সাথে সম্পর্ক যুক্ত। যেমন, কারখানা আইন অনুসারে যে সকল নিরাপত্তা ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে তার উলে- খ নিষ্প্রয়জন। বীমাযোগ্য স্বার্থের নীতি অনুসারে একটি বীমা চুক্তি হতে হলে বীমাকৃত বিষয়বস্তুতে বীমা গ্রহীতার বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকা আবশ্যক। বীমাযোগ্য স্বার্থ ব্যতিত কোন বীমা চুক্তি হলে, তা বাজী ধরার চুক্তি হবে; বীমা চুক্তি হবে না। তাই বীমাযোগ্য স্বার্থ বীমা চুক্তির একটি অবশ্যকীয় শর্ত। বীমা চুক্তিকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়। বীমার মূল উদ্দেশ্য হলো কারো কোন আর্থিক ক্ষতি হলে তা পূরণ করে দেয়া অর্থাৎ আর্থিকভাবে পূর্বের অবস্থায় ফিরিয়ে আনা। একটু কমবেশি করা যাবে না। বীমা করে কাউকে লাভবান হবার সুযোগ দেয়া হয় না। অবদানের নীতি বলতে যখন কোন একটি বিষয়বস্তুর উপর একাধিক বীমা পত্র গ্রহণ করে এবং ক্ষতিগ্রস্থ সকল বীমাকারীগণ মিলিতভাবে ক্ষতিপূরণ করবে; যাতে বীমাগ্রহীতা একই বিষয়বস্তু বীমা করে মোট ক্ষতির বেশী আদায় করতে না পারে। বীমাকৃত বিষয়বস্তু ক্ষতিগ্রস্থ হলে ক্ষতিপূরণ দেবার পূর্বে অবশ্যই নিশ্চিত হতে হবে ক্ষতির কারণ কি? যদি ক্ষতির করণ বীমাকৃত হয়, তবেই শুধু ক্ষতিপূরণ দাবী করা যায়; নতুবা নয়।

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৭.৫

সঠিক উত্তরের পাশে টিক চিহ্ন (√) দিন

১. কোনটি বীমা নীতির বহির্ভূত?
   ক) চূড়ান্ত সদ্বিশ্বাস খ) বীমাযোগ্য স্বার্থ
   গ) ক্ষতিপূরণ ঘ) তথ্য গোপন

২. কোন বিশেষ আইনে প্রদত্ব বিষয় বীমা চুক্তির সময় ব্যক্ত করা ____ ।
   ক) প্রয়োজন খ) নিষ্প্রয়োজন
   গ) অবশ্য প্রয়োজন ঘ) কোনটি নয়

৩. ক্ষতিপূরণের পরিমাণ কত?
   ক) ক্ষতির চেয়ে কম খ) ক্ষতির চেয়ে বেশি
   গ) ক্ষতির সমপরিমাণ ঘ) কোনটি নয়

উত্তরমালা

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৭.১

১. ক ২. খ ৩. গ ৪. ক ৫. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৭.২

১. ক ২. গ ৩. খ ৪. ঘ ৫. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৭.৩

১. ক ২. খ ৩. গ ৪. গ ৫. ক

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৭.৪

১. ক ২. ঘ ৩. ঘ

পাঠোত্তর মূল্যায়নঃ ৭.৫

১. ক ২.

প্রশ্নাবলী

সংক্ষিপত প্রশ্ন

১. বীমা বলতে কি বুঝেন?
২. বাংলাদেশ ইন্স্যুরেন্স একাডেমির উদ্দেশ্য বর্ণনা করুন।
৩. বীমার প্রাথমিক কার্যাবলীর সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দিন।
৪. বীমার অর্থনৈতিক গুরুত্ব বর্ণনা করুন।
৫. ব্যক্তিগত জীবনে বীমার ভূমিকা কি?
৬. পূন:বীমা ও দ্বৈত বীমার মধ্যে পার্থক্য বর্ণনা করুন।
৭. যৌথবীমার বর্ণনা দিন।
৮. যৌথবীমা ও দ্বৈত বীমার চুক্তির মধ্যে প্রধান প্রধান পার্থক্য লিখুন।
৯. বীমাযোগ্য স্বার্থ হবার শর্তগুলো কি কি?
১০. কি কি ভাবে ক্ষতিপূরণ দেয়া যায়?
১১. অবদানের নীতি প্রয়োগের শর্তগুলো কি কি?
১২. নিকটতম কারণ নির্নয়ের নীতিগুলো বর্ণনা করুন।

রচনামূলক প্রশ্ন

১. বীমার সংজ্ঞা দিন। বীমার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস বর্ণনা করুন। বীমার প্রকৃতিগুলোর বর্ণনা দিন।
২. ক) বীমার গুরুত্ব ও ভূমিকা বর্ণনা করুন।
   খ) বীমার শ্রেণী বিভাগ বর্ণনা করুন।
৩. ক) পূন:বীমা ও দ্বৈত বীমার মধ্যে পার্থক্য করুন।
   খ) বীমা চুক্তি ও বাজী ধরার চুক্তির মধ্যে পার্থক্য করুন।
৪. বীমার সাধারণ ও বিশেষ উপাদানগুলো বর্ণনা করুন।
৫. ক) বীমাযোগ্য স্বার্থের শর্তগুলো বর্ণনা করুন।
   খ) কি কি বিষয়ের উপর বীমাযোগ্য স্বার্থ আছে?
   গ) কোন ধরণের বীমার ক্ষেত্রে কখন বীমাযোগ্য স্বার্থ থাকা আবশ্যক?
৬. ক) চূড়ান্ত বিশ্বাসের নীতি বলতে কি বুঝেন?
   খ) কোন্ কোন্ তথ্য বীমা গ্রহীতার প্রকাশ করা বাধ্যতামূলক?
   গ) কি কি তথ্য প্রকাশ করা জরুরী নয়?
   ঘ) বীমার দায় গ্রহণ ও দাবী পূরণের ক্ষেত্রে চুড়ান্ত বিশ্বাসের নীতি প্রয়োগের বর্ণনা দিন।
৭. ক) "বীমাকে ক্ষতিপূরণের চুক্তি বলা হয়" ব্যাখা করুন। ক্ষতিপূরণের নীতি প্রয়োগের ক্ষেত্রে গড় পদ্ধতির উদাহরণসহ ব্যাখা করুন।
   খ) ক্ষতিপূরণ করার পদ্ধতিগুলো বর্ণনা করন।
৮. ক) স্থলাভিষিক্ততার নীতি বলতে কি বুঝেন?
   খ) কিভাবে স্থলাভিষিক্ততার অধিকার জন্মায়?
   গ) স্থলাভিষিক্ততার নীতি প্রয়োগের জন্য কি কি বিষয়ে জ্ঞান থাকা প্রয়োজন?
৯. ক) অবদানের নীতি বলতে কি বুঝেন?
   খ) অবদানের নীতি প্রয়োগের শর্তগুলো বর্ণনা করুন।
   গ) অবদানের নীতি কিভাবে কাজ করে উদাহরণসহ বর্ণনা করুন।
১০. ক) নিকটতম কারণ নীতি বলতে কি বুঝেন। উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।
   খ) নিকটতম কারণ নির্ধারণের নীতিগুলো বর্ণনা করুন।